গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ - ১৭ সংখ্যা-২ মার্চ - এপ্রিল ২০২০ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

সূচি

১ আমাদের কথা

২০১৯-এ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২
ডা: শঙ্কর কুমার নাথ

পদার্থ বিদ্যায় নোবেল ২০১৯ ৪
রতন দেবনাথ

অর্থনীতিতে নোবেল দারিদ্র দূরীকরণের নতুন দিকনির্দেশ ৫
সাগ্নিক

৮ বিকল্প শক্তির আঁতুরঘর
তপন দাস

১০ গাছের প্রাণ
প্রণব নাথ চক্রবর্তী

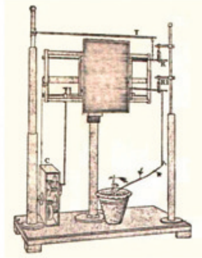

১৪ আপেক্ষিক তত্ত্ব একটি সহজ পাঠ
অনিন্দ্য দে

১৮ দৃষ্টি পরিধি
ডা: শিবপ্রসাদ পাল

১৯ সংবাদ

২০ গুননীয়ক ও গুনিতক
মনতোষ মিত্র

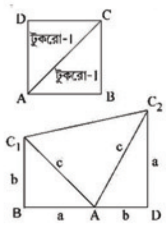

২২ ডিম
জয়দেব দে

২৩ শব্দজব্দ
অনিন্দ্য দে

জয়দেব দে অনিন্দ্য দে

একাধিক সূর্যযুক্ত নক্ষত্র মন্ডল ২৬
অমিতাভ চক্রবর্তী

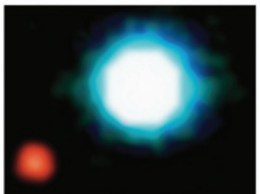

২৪ মহাবিশ্বের বিশালতা
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ আইন বিলীয়মান জীববৈচিত্র
বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

কবিতা ২৮
সুব্রত রুদ্র
জগন্ময় মজুমদার
সুনীল শর্মাচার্য
প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপ্রসাদ পাল
নির্মাল্য দাশগুপ্ত

৩০ আন্তঃ সীমান্ত নদী
অনুপ হালদার

৩৩ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak
: e-mail :
1. bigyanannesak1993@gmail.com.
2. bijnandarbar1980@gmail.com.
: Whatsapp No. :
9143264159 (Anup Haldar)
8240665747 (Samrat Sarkar)

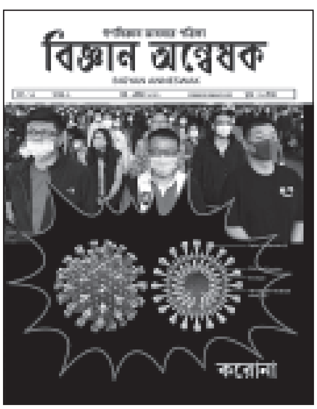

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা

তাপস মজুমদার

সুভাষিতম্

'জীবাণু কিছুই নয়, ক্ষেত্রটিই সব।'

—ক্লড বারনারড

(ফরাসি শারীর বিজ্ঞানী)

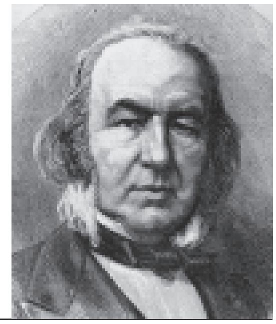

আমাদের কথা

লড়াই

একদিকে করোনা ভাইরাস,
অন্যদিকে শত শত বছরের বিজ্ঞান চিন্তার শক্তি।
একদিকে নতুনতর পরিবর্তিত জীবাণু,
অন্যদিকে তাঁকে জেনে বুঝে প্রতিহতের কৌশল।
একদিকে অনন্ত অতীতের লড়াকু ভাইরাসের দল,
অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রয়োগ।
একদিকে আধুনিক পরিবহন নির্ভর দ্রুত ছড়িয়ে পড়া,
অন্যদিকে দেশে দেশে যাতায়াতের নিয়ন্ত্রণ।
একদিকে আবার একটা প্লেগ বা সোয়াইন ফ্লু মহামারির হাতছানি,
অন্যদিকে তুলনামূলক কম মৃত্যুর মাধ্যমে মারির বিনাশ।
যদিও আক্রান্ত লাখখানেক
যদিও মৃত্যু দুহাজার ছাড়িয়ে
তবুও হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মীর জীবনপন
দিনে রাতের সেবা
সারা মুখে ক্ষতচিহ্নের ইতিহাস।

মানুষের এই লড়াইকে আমাদের স্যালুট।

—তাপস মজুমদার

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

অ জ য় ম জু ম দা র

নভেল করোনা ভাইরাস—সৃষ্টিকে ধ্বংসের হুংকার

উদ্বেগ বাড়ছে চিনে। সেখানে মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে নভেল করোনা ভাইরাসে। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে। আশঙ্কা, মৃত্যু আরও বাড়বে। আক্রান্ত এক লক্ষাধিক। চিনের এক চিকিৎসকও মারা গেছেন এই সংক্রমণে। আক্রান্তের খবর আসতে শুরু করেছে আরও ১৮টি দেশ থেকে। এই ভাইরাস ইউরোপের মূল ভূখণ্ডেও সংক্রমিত হয়েছে। চিনের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে আসছে। সেই এলাকার দোকানপাট স্কুল-কলেজ সব বন্ধ করা হয়েছে। চিনের বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সংক্রমিত এলাকাগুলিকে। সংক্রমণ সারা পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করবে কিনা সেকথা হলফ করে বলা কঠিন।

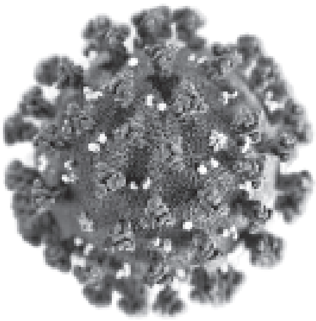

করোনা কি ধরনের ভাইরাস ঃ এটি এক ধরনের করোনা ভাইরাস। এর অনেকরকম প্রজাতি আছে। মাত্র ৭টি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। করোনা ভাইরাসের আরেক নাম—‘এন সি ও ভি’। বিজ্ঞানীদের অনুমান এই ভাইরাস মানুষের দেহকোশের ভেতরে পরিব্যক্তি বা মিউটিশান ঘটিয়েছে অর্থাৎ গঠনগত পরিবর্তনে নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। বংশবৃদ্ধিও করে চলেছে প্রতিনিয়ত। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেছেন—এই ভাইরাসে এক মানুষের দেহ থেকে অন্য মানুষের দেহতে ছড়িয়ে পরাটা স্বাভাবিক ঘটনা।

ভয়ংকর রূপের প্রকাশ ঃ এক দশক আগে সার্স সম্পূর্ণ নাম—সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম নামক ভাইরাস সংক্রমণে পৃথিবীতে ৮০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেটিও করোনা ধরনের ভাইরাস ছিল। এছাড়া আরও একটি ভাইরাস সংক্রমিত রোগের কথা জানা যায়—নাম ‘মিডল ইস্টার্ন রেসপিরেটরি সিনড্রোম’ বা মার্স। এতে ২০১২ সালে ৮৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণে প্রথমে ফুসফুস সংক্রমিত হয়। শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে এই সংক্রমণ ছড়ায় হাঁচি, কাশির মাধ্যমে। সবশেষে মাল্টি অরগ্যান ফেইলিওর বা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া, নিউমোনিয়া এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ভাইরাস কতটা ভয়ংকর তা অবশ্য জানা নেই। আসলে ভাইরাস জগতে মানুষের বিচরণ খুবই কম। তার ওপর যখন তখন এর চরিত্র বদল করার ঘটনা ঘটছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অজানা থেকে যাচ্ছে অনেক অজানা তথ্য।

এই ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ ঃ নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হল—শ্বাস কষ্ট, কাশি সেই সঙ্গে জ্বর। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় সংক্রমণের পাঁচদিন পর থেকে। প্রথমে জ্বর। তার পর শুকনো কাশি। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট। এই অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।

সংক্রমণের উৎস ঃ ঠিক কি ভাবে সংক্রমণ প্রথম শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক ধারনা না থাকলেও কিছু সম্ভাবনার কথা বিশেষজ্ঞেরা জানান। প্রাণী থেকেই প্রথম ভাইরাসটি মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তারপর মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়েছে। সার্স ভাইরাস প্রথমে বাদুড় ও পরে গন্ধগোকুল থেকে মানুষের দেহে প্রবেশের কথা জানা যায় এবং সার্স ভাইরাস ছড়িয়েছিল উট থেকে।

নভেল করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে চিনের উহান শহরের সামুদ্রিক একটা খাবারকে উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উহান শহরের একটি বাজারে অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী বেচাকেনা হত। বিশেষ করে বেলুগা জাতীয় তিমি করোনা জাতীয় ভাইরাস বহন করতে পারে। এছাড়াও উহানের ওই বাজারে মুরগি, বাদুড়, খরগোস এবং সাপ বিক্রি হত। ওই বাজারে যে সব ব্যক্তি বাজার করেছে এবং রান্না করে খেয়েছে তাদের মধ্যেই সংক্রমণের সূত্রপাত বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। অনেকে অবশ্য বলছেন—গবাদি পশু থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায়।

প্রতিকারের ব্যবস্থা ঃ এই ভাইরাস নতুন। সুতরাং এই রোগ

সংক্রমণের কোন টিকা আবিষ্কার হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নিয়মিত হাত ধোয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। হাঁচি-কাশির সময় দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঠান্ডা ও ফ্লু আক্রান্ত মানুষ থেকে দূরে থাকার এবং সার্জিক্যাল মুখোশ পরার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গ্যাব্রিয়েল লিউং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে নির্দেশনার কথা বলেছেন—তা হলো হাত সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বার বার হাত ধুতে হবে। ঘরের বাইরে গেলে মুখোশ পরতে হবে। সংক্রমণ হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরামর্শ মুখোশ পরা (N_{95} Musk) এবং অন্য ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। কারণ অন্যকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো।

করোনা ভাইরাসের গঠন ঃ এটি নিদু ভাইরাস শ্রেণির। করোনা ভাইরিনা উপগোত্রের এটি সংক্রমণ ভাইরাস প্রজাতি। এই ভাইরাসের জিনোম নিজস্ব আর এন এ দিয়ে গঠিত। জিনোমের আকার ২৬-৩২ কিলো ব্যাসের মধ্যে হয়ে থাকে। এটি সব থেকে বড় আর এন এ যুক্ত। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাসটি দেখতে মুকুটের মত। ভাইরাসের উপরিভাগে প্রোটিন পরিপূর্ণ থাকে। এই প্রোটিন ভাইরাস স্পাইক পেপসেমার দ্বারা অঙ্গ সংস্থান করে। এই জাতীয় প্রোটিন সংক্রমিত হওয়া কলা বা টিস্যু ধ্বংস করে। সব রকমের করোনা ভাইরাস সাধারণত স্পাইক (এস), এনভেলাপ (ই), মেমব্রেম (এম) এবং নিউক্লিও ক্যালসিড (এন) নামক চার ধরনের প্রোটিন দেখা যায়।

শ্রেণিবিভাগ ঃ	গ্রুপ	ঃ ৪র্থ গ্রুপ (+) SSRNA
	বর্গ	ঃ নিদু ভাইরাস।
	পরিবার	ঃ করোনা ভাইরাদা।
	উপপরিবার	ঃ করোনা ভাইরিনা।
	গণ	ঃ আলফা করোনা ভাইরাস
		ঃ বিটা করোনা ভাইরাস
		ঃ ডেল্টা করোনা ভাইরাস
		ঃ গামা করোনা ভাইরাস।

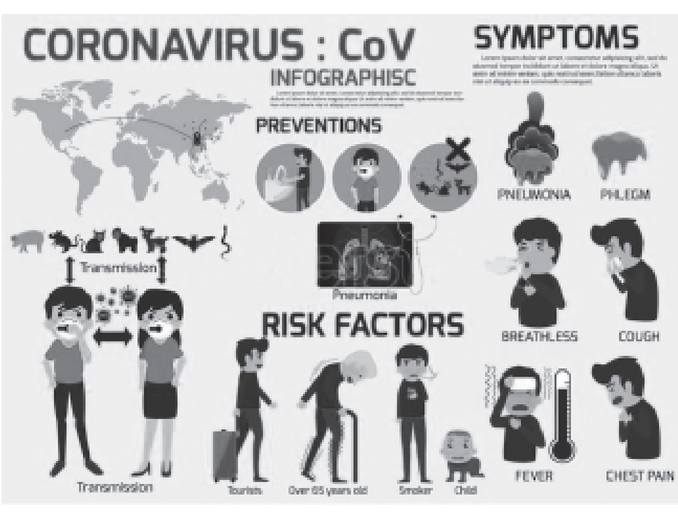

দেশে দেশে আতঙ্ক ঃ চিনের আতঙ্ক ভারতেও। কলকাতা সহ সাতটি বিমান বন্দরে সতর্কতা জারি করল ডিজিসি এ। চিন ও হংকং থেকে আসা যাত্রীদের বিস্তারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেই ছাড়ার সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন—এটি আসলে একটি ফ্ল্যাবিও ভাইরাস। এই

ধরনের ভাইরাস দ্রুত সংক্রমিত হয়। চিনের উহানের প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রকাশ্যে আসে। এরপর থেকে নতুন নতুন জায়গায় সংক্রমণের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এই ভাইরাস প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর সহ দেশের সাতটি প্রবেশ পথে ডিজিটাল থার্মাল স্ক্যানার-এর মাধ্যমে আক্রান্ত দেশ থেকে আগত রোগীদের স্পর্শ না করে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারা আরও প্রকাশ করেন—ভ্রমণকালীন সময়ে জীবিত ও মৃত গৃহপালিত বন্য প্রাণী থেকে দূরে থাকতে। নেপালে একজনের শরীরে এ ভাইরাসের দেখা মিলেছে। ইউরোপেও আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। জাপানের উপকূলে একটি সম্পূর্ণ জাহাজকে আটকে রাখা হয়েছে। জাহাজের

বাসিন্দাদের অনেকেই আক্রান্ত ও অনেকে মৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মানুষের যাতায়াতে (বিশেষ চিন থেকে) বাধা দেওয়া হচ্ছে। চিন বলছে তাদের ১৭০০ স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রামিত।

email:majumderajay@gmail.com • M. 8918824281

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্তী

মানুষের তৈরি প্রথম মৌল

তখন ১৯৩৩ সাল। ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ। আইরিন ও ফ্রেডারিক জোলিও-কুরি প্যারিসের গবেষণাগারে চালিয়ে যাচ্ছিলেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ওনারা দেখলেন শক্তিশালী আলফা কণা দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামকে আঘাত করলে সেখান থেকে প্রোটন বেরিয়ে আসে। অথচ জোলিও-কুরি দম্পতি সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ইলেকট্রন ও পজিট্রন এই কণাদের। পরীক্ষার ফলাফলের সন্তোষজনক ব্যাখ্যার জন্য সপ্তম সল্‌ভে কনফারেন্সে তাঁরা যে নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন, উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে তা তুমুল বিতর্কের জন্ম দিল। তবে ঠিক পরের বছরই বোরন এবং অ্যালুমিনিয়ামের মত হালকা ও স্থায়ী মৌলদের নিয়ে এই পরীক্ষায় সফল হলেন তাঁরা। বোরন থেকে তৈরি হল তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন। একইভাবে ফসফরাস ও সিলিকনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া গেল অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থেকে। আবিষ্কার হল কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন শক্তিশালী কণা দিয়ে কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে নতুন মৌলের পরমাণু ও তাদের বিভিন্ন আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব।

ঠিক যেন এমন কোন পদ্ধতিই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু প্রশ্ন হল নতুন মৌল তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা হঠাৎ এত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন কেন? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে আরও ছ'দশক আগে। তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানচর্চাকারীদের মধ্যে জানা মৌলের সংখ্যা মাত্র তেষট্টিটি। প্রতিটি মৌলই তাদের ধর্ম ও চরিত্রে আলাদা। ১৮৬৯ সাল। মৌলদের বিভিন্ন ধর্মের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে বের করে তাদের একটি যৌক্তিক ছকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করলেন রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। ওই বছরই মার্চের ৪ তারিখে রাশিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় 'The Dependence between the Properties of the Atomic Weights of the Elements' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি পেশ করলেন পর্যায় সারণী (Periodic table)-র ধারণা। তবে এরও বছর পাঁচেক আগে লোথার মেয়ের নামে এক জার্মান রসায়নবিদ ২৮টি মৌলকে নিয়ে তাদের ধর্মের ভিত্তিতে এই ধরনের এক সারণীর প্রাথমিক ধারণা দিয়েছিলেন। কিন্তু মেন্ডেলিভই প্রথম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে পর্যায় সারণীতে মৌলদের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে কয়েকটি অনাবিষ্কৃত মৌলের পূর্বানুমান করেছিলেন তিনি। ওই মৌলদের জন্য বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন ওই সারণীতে। যেমন অ্যালুমিনিয়াম, বোরন ও সিলিকনের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত তিনটি অজানা মৌলের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে তাদের নাম দিয়েছিলেন

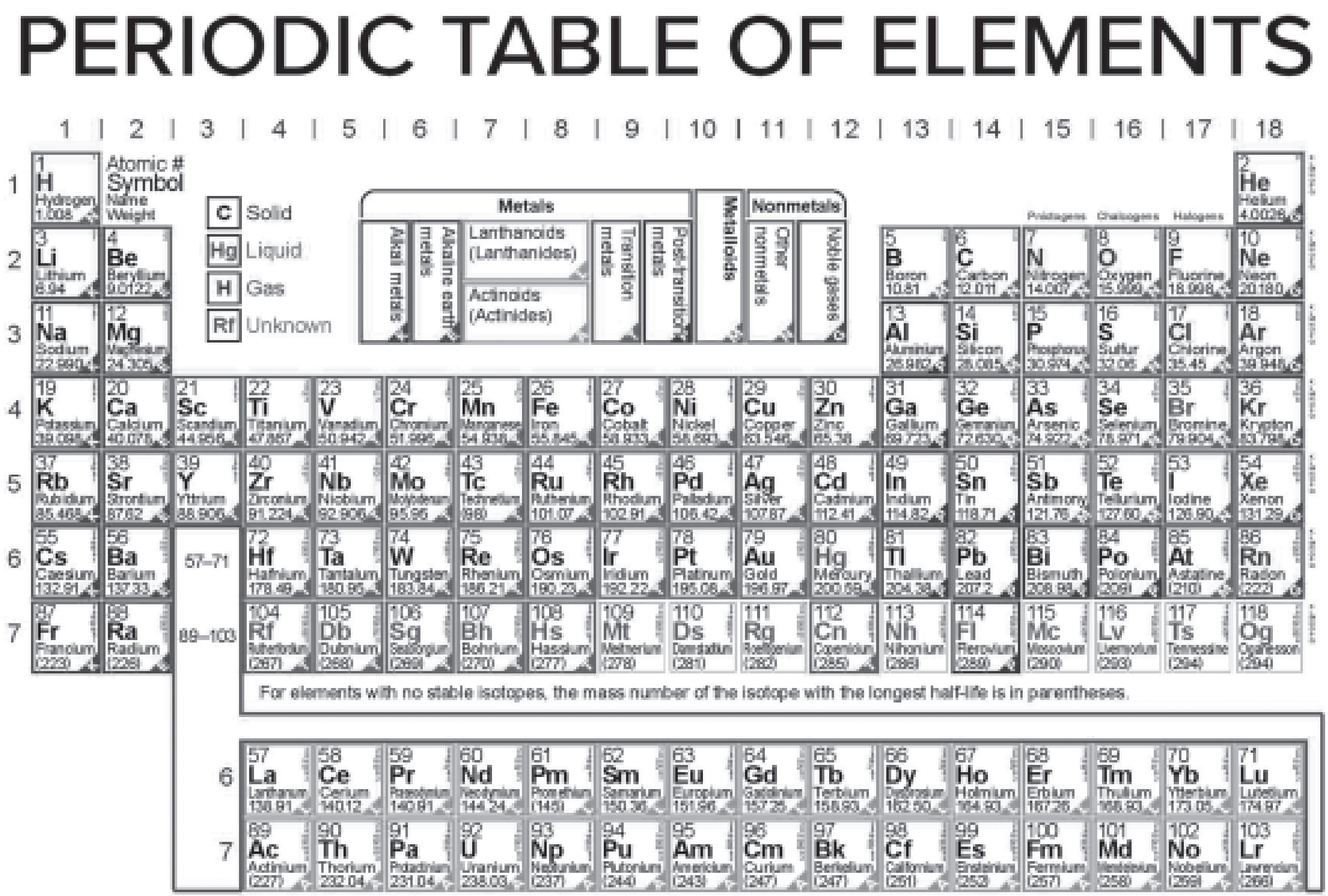

একা-অ্যালুমিনিয়াম, একা-বোরন ও একা-সিলিকন। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন সেই মৌলদের, যেগুলি গ্যালিয়াম, স্ক্যান্ডিয়াম ও জার্মেনিয়াম নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তখন চলছে পরমাণুর গঠন নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন (J. J. Thomson) আবিষ্কার করলেন ইলেকট্রন। এই ঘটনার প্রায় এক যুগ পর বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড প্রস্তাব করলেন পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত ধারণা; যেখানে প্রথম বলা হল পরমাণু-কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের কথা। যেকোনো পরমাণুতে ধনাত্মক আধানযুক্ত এই ভারী কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তনশীল থাকে ইলেকট্রনরা। ততদিনে গবেষকদের হাতে এসে গেছে এক্স-রে টেকনিক। হেনরি মোজলে (Henry Moseley) নামে এক তরুণ ইংরেজ করলেন এক অভিনব পরীক্ষা। অ্যালুমিনিয়াম (১৩ তম মৌল) থেকে আরম্ভ করে গোল্ড (৭৯ তম মৌল) পর্যন্ত চেনা মৌলদেরকে নিয়ে তাদের তীব্র গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন-বীম দিয়ে আঘাত করলেন। দেখলেন সেখান থেকে নির্গত এক্স-রশ্মির কম্পাঙ্ক মৌলদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক (atomic number)-এর সমানুপাতিক। পরপর উপস্থিত বিভিন্ন মৌলদের নিয়ে এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন যে ৪৩, ৬১, ৭২ এবং ৭৫ তম মৌলের জন্য উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স-রে সিগন্যালের স্থান ফাঁকা পরে আছে। মোজলে দাবি করলেন এই চারটি অবশ্যই অনাবিষ্কৃত মৌলরা। এই পরীক্ষার ঠিক দশ বছর পর হ্যাফনিয়াম (৭২ তম মৌল) এবং আরও দু'বছর পর রেনিয়াম (৭৫ তম মৌল) আবিষ্কার হলে মোজলের অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তবে ৪৩ ও ৬১ তম মৌল তখনো অজানা। বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি ধন্দে পড়লেন ৪৩ তম মৌলটিকে নিয়ে। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দাবি উঠল খুঁজে পাওয়া গেছে একে। এমনকি ১৯২৫ সালে জার্মান রসায়নবিদের এক দল (ওয়াল্টার নোডাক, অটো বার্জ ও ইডা ট্যাক) ৪৩ তম মৌলটি আবিষ্কার করেছেন, দাবি করে তার নামও প্রস্তাব করে বসলেন মেসুরিয়াম (তৎকালীন উত্তর প্রাশিয়ার প্রসিদ্ধ অঞ্চল মেসুরিয়ার নাম অনুসারে)। কিন্তু এই আবিষ্কারের

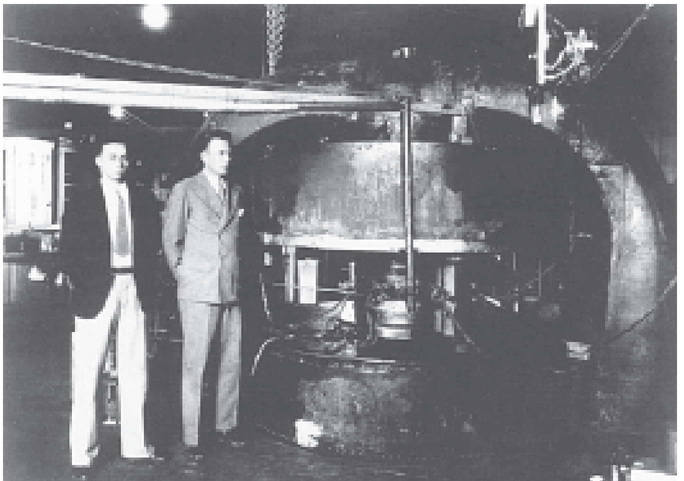

১৯৩৪ সাল। এস.এস. লিভিং স্টোন (বাঁয়ে) এবং ই.ও. লরেন্স্ (ডানদিকে) বার্কলের গবেষণাগারে তাদের ২৭ ইঞ্চি সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের সামনে।

শিরোপা শেষ পর্যন্ত দখল করেন এমিলিও সেগ্রেই ও কার্লো পেরিয়ার নামে দুই ইতালিও বিজ্ঞানী।

১৯৩৫ সাল। বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশন ল্যাবরেটরিতে 'ম্যাগনেটিং রেজোন্যান্স অ্যাক্সিলারেটর' নামে এক যন্ত্র তৈরি হল আর্নেস্ট লরেন্সের তত্ত্বাবধানে। যার পোশাকি নাম সাইক্লোট্রোন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ আধানগ্রস্থ কণারা পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে দীর্ঘ পাক খাওয়া পথ অতিক্রম করে তীব্র গতি লাভ করে। ডিউটেরিয়াম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ) আয়ন নিয়ে প্রথম এই কাজ শুরু করেছিলেন লরেন্স। এমিলিও সেগ্রেই

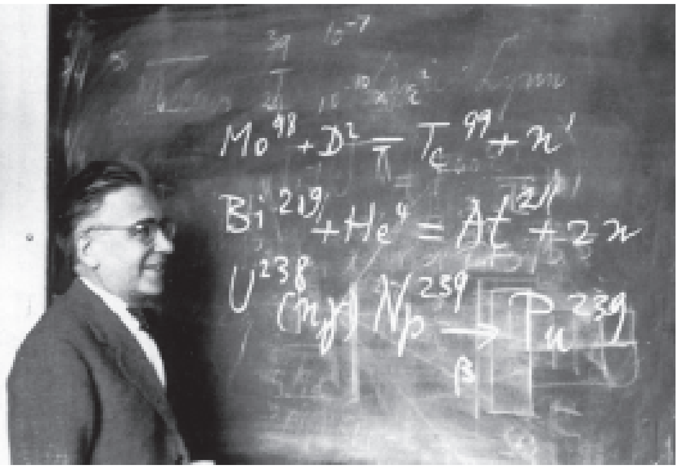

১৯৫২ সালে এমলিও সেগ্রেই

(Emilio Segrè) তখনো ইতালিতে বিখ্যাত পদার্থবিদ এনরিকো ফের্মির সঙ্গে গবেষণা করছেন। তবে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও বেশ জানাশোনা তাঁর। তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকা ভ্রমণে এসে তিনি ঘুরে দেখলেন লরেন্সের রেডিয়েশন ল্যাবরেটরি ও সাইক্লোট্রোন যন্ত্র। তিনি লক্ষ করলেন গবেষণাগারের বিভিন্ন জায়গায় বর্জ্য হিসাবে ছড়িয়ে পরে আছে তেজস্ক্রিয় ধাতব টুকরো। এদিকে কিছুদিন আগেই পালেরমো-তে নিজের গবেষণাগারে তেজস্ক্রিয়তা মাপক নতুন যন্ত্র বসিয়েছেন সেগ্রেই। গবেষণায় দেখলেন সেই টুকরোতে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট, জিঙ্ক ও সিলভার ছাড়াও রয়েছে ফসফরাসের (P^{32}) উপস্থিতি। সেগ্রেইর মাথায় এল এক নতুন ভাবনা। তার মনে হল এই ধাতব টুকরোর তেজস্ক্রিয়তা যে কেবলমাত্র চেনা মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের উপস্থিতির জন্য, এমনটা তো নাও হতে পারে! সাইক্লোট্রোন-বর্জ্য থেকে আরও কিছু ধাতব টুকরোর জন্য লরেন্সের কাছে চিঠি লিখলেন তিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই লরেন্সের ২৭ ইঞ্চি সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের অংশ হিসাবে চিঠির খামে করে একটুকরো মলিবডেনাম-এর পাত এসে পৌঁছল পালেরমোর গবেষণাগারে। তিনি লক্ষ করলেন মলিবডেনাম পাতের যে দিকটি যন্ত্রের দিকে মুখ করে আছে সেই অংশের তেজস্ক্রিয়তা অপর দিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ডিউটেরিয়াম আয়নের সঙ্গে মলিবডেনামের সংঘর্ষের ফলেই এমনটা হয়ে থাকার কথা। তিনটি সম্ভাবনার কথা মাথায় এল সেগ্রেইয়ের। (ক) মলিবডেনামের সঙ্গে ডিউটেরিয়ামের সংঘর্ষে নিউক্লিয়াসের নিউট্রন বা প্রোটন সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে সেখানে

মলিবডেনাম ও কুলম্বিয়াম (৪১ পরমাণু ক্রমাঙ্ক নিয়ে মলিবডেনামের ঠিক পূর্ববর্তী এই মৌলটি পরে নায়োবিয়াম নামে পরিচিতি লাভ করে)-এর কোনো নতুন আইসোটোপ তৈরি হয়েছে। (খ) ৪০ পরমাণু ক্রমাঙ্ক বিশিষ্ট জারকোনিয়াম উৎপন্ন হয়েছে, এমনকি হয়ত (গ) ৪৩ তম মৌলের আবির্ভাব ঘটেছে। সহকর্মী অধ্যাপক ও খনিজবিদ্যা বিশারদ কার্লো পেরিয়ারের সহযোগিতায় সেখানে থাকা চেনা মৌলগুলিকে রাসায়নিকভাবে আলাদা করে ফেললেন তিনি।

মলিবডেনামের পাতটিকে অম্লরাজে (aqua regia) দ্রবীভূত করে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর তারা বুঝলেন এর সক্রিয়তা জার্কোনিয়াম, মলিবডেনাম ও কুলম্বিয়ামের থেকে অনেকটাই আলাদা। তাহলে কি সত্যিই ওখানে ৪৩ তম মৌলটি আছে? তেজস্ক্রিয়তা থাকলেও অজানা মৌলটির রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা রেনিয়ামের

আইসোটোপ ঃ প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা বিভিন্ন এমন পরমাণুদের পরস্পরের আইসোটোপ বলে।
যথা ঃ হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ

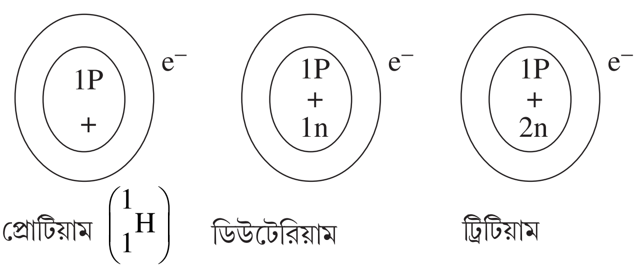

অর্ধায়ুকাল ঃ কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধেক পরিমাণ বিঘটিত হতে যে সময় লাগে বা অর্ধেক পরিমাণে পৌছতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় ঐ মৌলের অর্ধায়ুকাল।

এখানে , = বিঘটন ধ্রুবক

(Rh_{75}) মতন। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেগ্রেই দেখলেন এই অজানা মৌলটির দু'ধরনের আইসোটোপ এখানে আছে। একটির ভরসংখ্যা ৯৭ ও অর্ধায়ু ৯০ দিন, অপরটির ভরসংখ্যা ৯৫ ও অর্ধায়ু ৬১ দিন। উৎসাহিত সেগ্রেই নিজের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতে উপস্থিত হলেন আমেরিকাতে। তখন ১৯৩৮-এর জুলাই মাস। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে উঠল। সেগ্রেই খবর পেলেন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইহুদি অধ্যাপকদের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি হয়েছে যাদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই তালিকায় আছে তাঁর নামও। তিনি বুঝলেন ইতালিতে ফিরে যাওয়া তাঁর আর হবে না। বার্কলেতেই থেকে গেলেন তিনি। মাস চারেকের চেষ্টায় স্ত্রী ও পুত্রকেও নিয়ে এলেন সেখানে। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষকের মত তিনিও তখন আমেরিকার রিফিউজি। পরিচয় হয়েছে আমেরিকান রসায়নবিদ গ্লেন সিবর্গের সঙ্গে। দুজনে ছকে ফেললেন গবেষণার পরিকল্পনা। ৩৭ ইঞ্চি সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে রাখা মলিবডেনাম পাতকে আঘাত করা হল ৮ মেগাইলেক্ট্রনভোল্ট শক্তিসম্পন্ন ডিউটেরিয়াম দিয়ে। তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম, জার্কোনিয়াম ও কুলম্বিয়ামের সঙ্গে অজানা মৌল হিসাবে নিশ্চিত হল ৪৩ তম মৌলটির উপস্থিতি। আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম হওয়ায় পৃথিবীর চেনা পরিবেশের কোন আকরিকের মধ্যে যার থাকার কোন সম্ভাবনা প্রায় নেই।

২৯ অক্টোবর, ১৯৪৬ সাল। রয়্যাল ইন্সটিটিউশন অফ কেমেস্ট্রির উদ্যোগে 'The making of missing chemical elements' শীর্ষক এক সম্মেলন বসেছে ইংল্যান্ডের লীড্স শহরে। ৪৩ তম মৌলের আবিষ্কারক হিসাবে পেরিয়ার ও সেগ্রেইকে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি তাদের অনুরোধ করা হয়েছে এর উপযুক্ত নাম প্রস্তাবের জন্য। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত জার্নাল 'নেচার'-এর ৪ জানুয়ারি ইস্যুতে প্রকাশিত হয় পেরিয়ার ও সেগ্রেই-এর লেখা এক চিঠি। সেখানে তারা (গ্রীক শব্দ "τεχνητο΄ς" যার আক্ষরিক অর্থ 'কৃত্রিম' থেকে প্রভাবিত হয়ে) এই মৌলটির নাম প্রস্তাব করেন 'টেকনিশিয়াম' যার চিহ্ন Tc; পরে রসায়নের নীতি নির্ধারক সংস্থা IUPAC (International Union of Pure & Applied Chemistry) এই প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে প্রকৃতিতে টেকনিশিয়ামের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে ১৯৫২ সালে বহু দূরের এক নক্ষত্র থেকে আসা এক্সরশ্মির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। আসলে বিভিন্ন নক্ষত্রের অভ্যন্তর যেন একেকটি রাসায়নিক কারখানা, যেখানে উপযুক্ত পরিবেশে কোনো পরমাণু নিউট্রন গ্রহণ পদ্ধতিতে (s-process) নতুন মৌলের জন্ম দেয়। তবে এখানে মনে রাখা দরকার সূর্য কিন্তু এখনও এই উপায়ে নতুন মৌল তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়।

পেরিয়ার ও সেগ্রেই টেকনিশিয়ামের প্রথম যে দুটি আইসোটোপ খুঁজে পেয়েছিলেন সেগুলো এখন ^{97m}Tc (অর্ধায়ু ৯০ দিন) ও ^{95m}Tc (অর্ধায়ু ৬০ দিন) নামে পরিচিত। চিহ্নে ব্যবহৃত m অক্ষরটি টেকনিশিয়ামের স্বল্প-সুস্থিত নিউক্লিয়ার আইসোমার (metastable nuclear isomer)-কে নির্দেশ করে। তবে ডাক্তারি শাস্ত্রে বিভিন্ন রোগনির্ণয়ের জন্য ^{99m}Tc আইসোটোপটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। মাত্র ৬ ঘন্টা অর্ধায়ু সম্পন্ন এই আইসোটোপটি দেহে 'রেডিওঅ্যাকটিভ ট্রেসার' হিসাবে কাজ করে। টেকনিশিয়াম আবিষ্কারের পর থেকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত রোগনির্ণয় সংক্রান্ত বিভিন্ন মেডিক্যাল ইমেজিং ক্ষেত্রে। তাছাড়া ক্যান্সারের বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসায় নিউক্লিয়ার মেডিসিন থেরাপি ও রেডিয়েশন থেরাপির জন্যও ব্যবহৃত হয় একাধিক রেডিও আইসোটোপ। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির প্রাদোভা শহরে অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে এমিলিও সেগ্রেই-এর 'The Adventurous History of the Discovery of Technetium' শিরোনামে রাখা বক্তৃতার একটি লাইন খুব প্রাসঙ্গিক—"তেজস্ক্রিয়তা মানেই কেবল পারমাণবিক অস্ত্র বা ধ্বংস নয়, বিভিন্ন স্থায়ী মৌলের নতুন নতুন আইসোটোপ আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নিউক্লিও-বিজ্ঞানীরা আজও সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।"

email : acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

অ সী মা চ ট্টো পা ধ্যায়

বনৌষধির আবিস্কার এবং ক্রমবিকাশ

[বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ-এর অন্তর্ভুক্ত শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় বনৌষধি' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সংকলিত।]

যষ্টি মধু

বনৌষধি আবিস্কার করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। প্রকৃতির রত্নাগার হতে এই শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণের জন্য তারা যুগযুগান্ত ধরে পাগলের মত অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে; এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাদের "রোগের অমানুষিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।" তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না খুব বেশি— মানসিক কৃষ্টির অভাব ছিল যথেষ্টই— যেজন্য নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য যা কিছু প্রয়োজন তারও জন্য তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত প্রকৃতির উপরে, তারা জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহ করত বনের শাকসবজি ফলমূল থেকে, কাপড় জামা তৈরি করত গাছের ছাল পাতা দিয়ে, আর শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত পশুর লোমের আবরণ দিয়ে। রোগ যন্ত্রণায় ভুগলে অসহায়ের মত মুখ চেয়ে থাকত সেই প্রকৃতিরই উপরে। প্রাচীন মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছিল না খুব বেশি, আজকালকার সভ্য মানুষদের মত কৃত্রিম ওষুধ তৈরি করে নিজেদের কষ্টের লাঘব করার উপায় ছিল না। তাই তারা বনে বনে খুঁজে বেড়াত বনৌষধি—যার সাহায্যে পরিত্রাণ পেতে পারে রোগের হাত থেকে। একে একে সন্ধান মিলল ভারতীয় বনৌষধির। নদীমাতৃক শ্যামল ভারতবর্ষ প্রকৃতির ঐশ্বর্যলাভে গর্বিতা। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বনসম্পদ ভরা আছে তার কোষাগারে। এই বনজ গাছ ও লতাগুল্মাদি হতে প্রাচীন মানুষ উদ্‌ঘাটন করেছে প্রকৃতির গুপ্তরহস্য—আবিস্কার করেছে ভেষজ—যা দিয়ে শুধু নিজেদেরই যে রোগমুক্তির উপায় সৃষ্টি করেছে তা নয়—ভরে দিয়েছে বিশ্বের জ্ঞানের কোষাগার তাদের অভিনব গবেষণায়। এই বনজ হয়েছে পরিচিত বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রে "ভারতীয় বনৌষধি" নামে। তারপর ধীরে ধীরে এই বনৌষধির ক্রমবিকাশ লাভে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে বর্তমান ভারতের ভেষজশাস্ত্র।

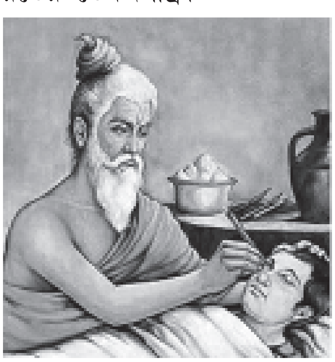

সুশ্রুত

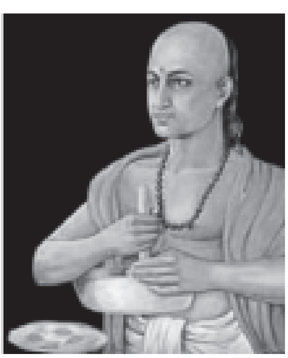

চরক

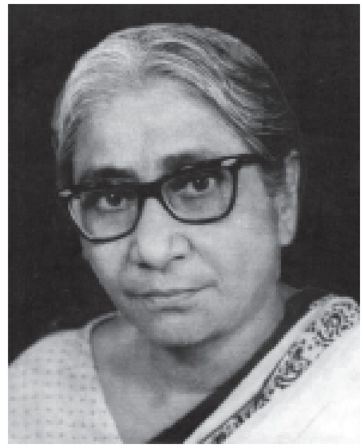

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় গাছগাছড়া ও লতাগুল্মাদি হতে যে সমস্ত বনৌষধি আবিস্কৃত হয়েছে তার ব্যবহার এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ণনা কিছু পাওয়া যায় বৈদিক যুগের রচিত আয়ুর্বেদে। আয়ুর্বেদে মাত্র একশো বনৌষধির উল্লেখ আছে, তাই থেকে মনে হয় যে এর বেশি গাছের গুণাগুণ জানতে পারা তখনকার লোকের পক্ষে বোধহয় সম্ভব হয়নি। এর পরবর্তী রচনা হচ্ছে চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতা। এই সংহিতা পড়লে মনে হয় যে বৈদিক যুগের পরবর্তী আর্যরা অনেক বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সুশ্রুত তাঁর লিপিকায় দ্বাদশ অধ্যায়ে তখনকার ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং ভেষজ প্রয়োগের নানা প্রণালী অতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সুশ্রুত সংহিতায় প্রায় সাতশো গাছের ভেষজগুণ বর্ণনা করা আছে কিন্তু এই সাতশো গাছের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় হলেও বৈদেশিক গাছের নামোল্লেখ কিছু পাওয়া যায়। তাঁরা যখন সংহিতা রচনা করেছিলেন তখন ব্রহ্মদেশ এবং তিব্বত থেকে নানা উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভারতবর্ষে ওষুধ হিসাবে আমদানি হত। আর্যদের প্রাচীন ভেষজের মধ্যে যষ্টিমধুর ব্যবহারের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এই গাছ ভারতের নিজস্ব নয়। এর আদিম বাস এশিয়া মাইনর, আরব, পারস্য এবং তুর্কিস্থান। এইসব দেশ হতে বেদিয়ারা যষ্টিমধু সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে চালান করত। ভারতের উর্বর মাটিতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে বর্তমানে যষ্টিমধু ভারতজাত হয়ে গেছে। চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতা বৌদ্ধযুগের আগেকার রচনা বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ সালে সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতের শহরে শহরে এবং বড় বড় রাস্তায় অসুস্থ ও আহতদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা তাঁদের প্রচারের কাজে পূর্ব উপদ্বীপ, চিন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, তাতার, পারস্য এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ঘুরতেন এবং ভ্রমণকালে এই সমস্ত বিদেশের নানা গাছগাছড়া সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে

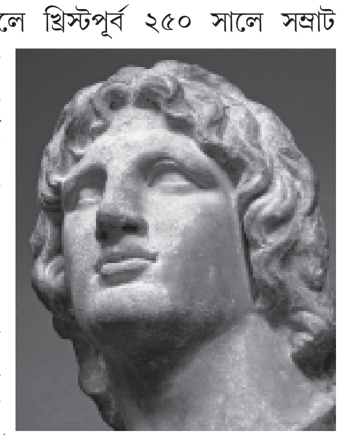

আলেকজান্ডার

আনতেন। এই গাছগাছড়া ভারতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে বর্তমানে ভারতীয় গাছ বলেই চলিত হয়ে গেছে। খ্রিস্টজন্মের তিনশো বছর আগে দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে যে সমস্ত গ্রিক পণ্ডিত ভারতে এসেছিলেন তাঁরা হিন্দুদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অতি আদরের সঙ্গে পড়াশুনো করেন, ফলে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার যশ শুধু গ্রিসে নয়, মিশর এবং রোমে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজান্ডারের পর অন্যান্য গ্রিকপণ্ডিত ভারতবর্ষ ও গ্রিসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে চিকিৎসার্থে ভারত হতে নানা প্রকার বনৌষধি গ্রহণ করেন, এইভাবে গ্রিক ও রোমান চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় আয়ুর্বেদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। বিখ্যাত গ্রিক বৈদ্য ডিওসকোরাইডিস (Dioscorides) তাঁর গ্রন্থে হিন্দু আয়ুর্বেদের কাছে তাঁর দেশের ঋণ স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতের বহু ভেষজ প্রাচীন রোমে রপ্তানী হত। প্লিনির (Pliny) সময় এই ব্যবসার এত প্রসার হয়েছিল যে রোমের বহু সোনা ভারতে চলে যেত বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন।

ডিওসকোরাইডিস

মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তর আসে। প্রাচীন দর্শন বা বিজ্ঞানচর্চায় তাঁদের অনুরাগ বিশেষ ছিল না কিন্তু নতুন আবিস্কার বা মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে সফলতা লাভ না করলেও জগতের প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান সযত্নে তাঁরা রক্ষা করতেন। বাগদাদের রাজ দরবারে বৈদ্য ছিলেন হিন্দুরা। মুসলমান আমলে চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হিপোক্রেটাস ও ডিমোক্রাইটস্ প্রভৃতি গ্রিক বৈদ্যদের চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রণালী মোহম্মদের দেশবাসীরা জগতে প্রচার করেছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে ইউনানি হাকিমরাও বাদশাহদের সভায় বৈদ্য হিসাবে নিযুক্ত হতেন এবং অনেক মাইনেও পেতেন। বাদশাহের এবং প্রজাদের চিকিৎসা এই ভেষজ প্রণালীতেই চলত। ইউনানি হাকিমরা মধ্য-এশিয়ার নানা রকমের গাছপালা ভৈষজ্যগুণ গ্রিক বৈদ্যদের কাছ থেকে শিখে ঐ সকল গাছপালা ভারতে আমদানি করতেন। মুসলমানদের কাছ থেকে এই সমস্ত বিদেশজাত বনৌষধি নিয়ে হিন্দুরা ব্যবহার করতেন। আগন্তুক বনৌষধিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আফিং। প্রাক-মুসলমান যুগের হিন্দু আয়ুর্বেদে আফিং-এর কোন উল্লেখ নেই। ইউনানি হাকিমরা এই দেশীয় গাছগাছড়া আলোচনা করে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বই লিখে গেছেন—তার মধ্যে প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে তালিকা সেরিফ এবং মাখজান-উল-আদ্দিয়া।

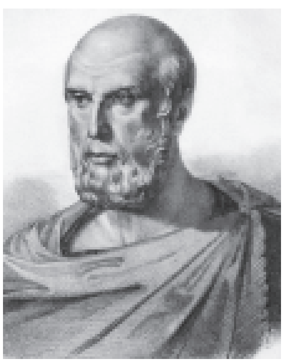

হিপোক্রেটাস

ভারতবর্ষে খ্রিস্টিয় যুগ আরম্ভ হওয়ার পর হতে চিকিৎসক এবং উদ্ভিদ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে দেশীয় ও আগন্তুক গাছগাছড়া সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় জলপথের আবিষ্কর্তা পর্তুগীজেরা বহুকাল পর্যন্ত ভারতের হরিতকি, আমলকি ও বহেড়ার আশ্চর্য গুণ এবং ক্ষমতা জানতে পেরে দেশে দেশে এই ত্রিফলার অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। সিংহল, পূর্ব-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, মাকাসার প্রভৃতি অঞ্চলের নানাপ্রকার মশলা পর্তুগীজরা বিলিম ও জেনোয়ায় বণিকদের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনতেন। এই বণিকরা মুসলমানদের কাছ থেকে ঐ সমস্ত মশলা অনেক সস্তায় পেতেন। সেই থেকে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ফলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকারও আবিষ্কার হয়, আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় নানারকমের গাছ সেখান হতে ভারতে আমদানি হয়ে অল্পকাল মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব আগন্তুক গাছের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়; তা ছাড়া তার মধ্যে অনেক গাছের দেশি কোন নামও নেই। তবে নিত্য ব্যবহার্য এবং সুপরিচিত কয়েকটি গাছের আমদানি ও কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। মুসুর ডাল, খেসারি, গাজর, বাঁধাকপি, বড় মেথি, পানমৌরি, খরমুজ, ক্ষীরা (শশা), পেঁয়াজ, রসুন, গন্ধিনা (Leek), তিসি ও কালজিরে ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ হতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়েছে। মধ্যএশিয়া হতে চালান এসেছে শালগম, সাদা সরষে, একরকম কালো সরষে, গম, বিটপালং, আফিং, গাঁজা বা সিদ্ধি ও ঘোড়ানিম। আফ্রিকা থেকে এসেছে সিম, লঙ্কাসিজ, টকপালং, রেড়ি, বিলিতি আমকুশী, সরগোজা (যার তেল সরষের তেলে ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়), ধুঁধুল, ঝুমকো জবা, বড় কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল, ডালিম এবং মশা তাড়াবার জন্য একরকম বিলাতি তুলসি। চিন, জাপান থেকে আমদানি হয়েছে জবা, কর্পূর, দশবাইচণ্ডি, রঙ্গন, লকেটফল, লিচু, চিনানারিঙ্গি, বরবটি, ওলটকম্বল এবং রক্তকরবী। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া হতে আগন্তুক গাছগুলির মধ্যে সুপরিচিত—চালতা, চাঁপা, কাঁঠালি চাঁপা, স্থলপদ্ম, সাদাশিমূল, কামিনী, কনকচাঁপা, বোলা, বুদ্ধ নারিকেল, বাতাবি লেবু, হিমসাগর বা পাথরচুর—যাকে পূর্ব বাংলায় অনেক জায়গায় "বালা পাতা" বলে এবং সুগন্ধ বালা হিসাবে

আমলকি *হরিতকি* *বহেড়া*

পেঁয়াজ *শশা* *গম*

ব্যবহার করে। আয়ুর্বেদের "পাষাণভেদ" অনেকের মতে এই গাছকেই বোঝায়। বালা পাতা ভারতবর্ষে প্রথম আসে ১৭১৯ সালে, এখন ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। এ ছাড়া আমলকি, সুপারি, তলদা বাঁশ আরও নানা জাতীয় বাঁশ, লকুচ বা মাদার বা ডহুয়া, পুত্রঞ্জীব, তেজপাতা, সেগুন প্রভৃতি এসেছে পূর্ব এশিয়া হতে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের পর নানা পথ দিয়ে অনেক গাছ ভারতে আসে, তার মধ্যে গোল আলু প্রধান। ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমস স্যার টমাস রো-কে ভারতবর্ষে দূত হিসাবে পাঠান। তাঁকে আসফ চাঁদ অতি দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য গোল আলু খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এর আগে ভারতবর্ষে গোল আলু ব্যবহারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। লঙ্কা, তামাক, ভুট্টা, শাক-আলু, লজ্জাবতী, চার কোণা সিম, সূর্যমুখী, শেয়ালকাঁটা, গুলমখমল, আয়াপান, গাঁদা, নয়নতারা, কৃষ্ণকলি, দাদমর্দন, আতা, নোনা,লটকন, আমড়া, মেহগিনি, পেয়ারা, পেঁপে, হরকরা, ফণীমনসা, কলকে, বাগানবিলাস, বাগভেরেন্ডা', লালপাতা আনারস, রজনীগন্ধা এবং কচুরিপানা এসেছে আমেরিকা হতে। ভারতে দেশীয় গাছ ছিল অনেক, তার উপর এসেছেও বিস্তর। তাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা বা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর। প্রথম এক জার্মান বিজ্ঞানী ভন রিড (Von Rheed) ভারতীয় গাছগাছড়া আলোচনা করে তাদের সম্বন্ধে একটি বই রচনা করেন,

এশিয়াটিক সোসাইটি ও স্যার উইলিয়াম জোন্স

নাম তার হরটাস মালাবেরিকাম (Hortus Malabaricum)। তারপর বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় স্যার উইলিয়াম জোনসের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় বনৌষধির প্রকৃত গবেষণা আরম্ভ হয় এবং তিনি এই বিষয়ে জনসাধারণের অনুরাগ সৃষ্টি করেন। ফলে ভারতবর্ষে অরণ্য বিভাগ এবং স্কুল অফ ফরেস্ট্রি স্থাপিত হয়েছে এবং বনৌষধি সম্পর্কিত অনুসন্ধান সাগ্রহে চলেছে। বড় বড় উদ্ভিদজ্ঞ—স্যার ডি জর্জ ওয়াট, মি: গ্যাম্বল, ডাক্তার স্টুয়ার্ট, কীর্তিকর এবং বসু ডাক্তার ওয়ারিং, ওয়ালিচ গ্রিফিথ বেনথাম, হুকার, অধ্যাপক রক্সবার্গ, জন ফ্লেমিং এন্সলি প্রমুখের সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় ভারতের নানা প্রদেশের গাছগাছড়া এবং তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তর বই রচিত হয়েছে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে ভারতজাত উদ্ভিজ পদার্থের গুণ পরীক্ষার জন্যে বোম্বাই শহরে পেটিট লেবরেটরি তৈরি হয়। পরে ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারি গবেষণাগারে ভারতজাত গাছের রাসায়নিক গুণ পরীক্ষিত হতে থাকে।

ব্যাঙ্গালোরে টাটার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কয়েকজন কর্মী এই কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে ভারতজাত বনৌষধির গুণ পরীক্ষার জন্যে ৫০,০০০ টাকা দান করেন। এখন ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেশীয় গাছগাছড়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এই ভেষজগুলির মধ্যে যেগুলির ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে এসেছে সেগুলির গুণাগুণ ভাল করে পরীক্ষা করার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। গাছপালা চেনবার এবং ভৈষজ্য সার নিষ্কাশনের উপযুক্ত রাসায়নিক প্রণালী আবিস্কারের চেষ্টা চলেছে। এগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন নির্ধারণের এবং কৃত্রিম উপায়ে এগুলির উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করে সাধারণের কাজে লাগানোর প্রসঙ্গে সকলের অগ্রণী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৮৯৭ সালে যখন তিনি

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই এ বিষয়ে তাঁর নজরে পড়ে, তিনি প্রথম লেবুর রস থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric acid) তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলকাতায় লেবু সস্তা না হওয়ায় বিষয়ান্তরে তাঁকে মন দিতে হয়। তারপরে কয়েকজন বিখ্যাত কবিরাজের কাছে উপদেশ এবং উৎসাহ পেয়ে কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মীর সহযোগিতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করে নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। কালমেঘ, বাসক, অশোক, কুর্চি, যোয়ান ইত্যাদি দেশীয় ওষুধ হতে টিনচার—পরিভাষায় যাকে বলে তরলসার তৈরি করেন। এগুলি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ঘরে আদর পেতে থাকে। কলকাতায় এই ব্যবসার প্রসারের পর কলকাতার বাহিরেও কিছু কিছু চাহিদা হতে থাকে। বর্তমানে এই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতের সবচেয়ে বড় দেশীয় ওষুধ তৈরির কারখানা। বেঙ্গল কেমিক্যালের দেখাদেখি আরও সমস্ত কারখানা সৃষ্টি করার প্রধান কারণ হচ্ছে বিলিতী এবং কৃত্রিম ওষুধ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সে তুলনায় আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্জ ভেষজ খুবই সস্তা। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হলেও ভারতবাসী অত্যন্ত গরিব, তাদের দৈনন্দিন আয় এত কম যে কোনোরকমে তারা নিজেদের ভরণপোষণ চালাতে পারে না আর অসুস্থ হলে ওষুধের দাম দিতে অক্ষম বলে বিনা চিকিৎসায় তাদের মরতে হয়। কাজেই গরিব ভারতবাসীদের পক্ষে দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীই সর্বতোভাবে সঙ্গত। দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অতি অল্প ব্যয়সাধ্য বলেই এখনও এই চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে লুপ্ত হয়নি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ এটি উপলব্ধি করেই ভারতীয় ভৈষজ্য শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত করবার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন।

অ নি ন্দ্য দে

আপেক্ষিক তত্ত্ব ঃ একটি সহজ পাঠ

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় যা ছিল ঃ

উপর-নীচ, ছোট-বড়, কম-বেশি—আমাদের রোজকার জীবনের এই বিষয়গুলোর মত গতিও আপেক্ষিক। কিন্তু ব্যাপারটা আমরা সহজে বুঝতে পারিনি। কারণ, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে বস্তুর পরম গতি নির্ণয় করে ফেলাটা অসম্ভব কিছু নয়। আর তার জন্যই তৈরি হয়েছিল ইথারের ধারণা। কোনও বস্তুর পরম গতি আসলে এই ইথার সমুদ্রের সাপেক্ষে তার আপেক্ষিক গতি। পদার্থবিদেরা ভেবেছিলেন আলোর গতির সাথে বস্তুর গতির তুলনা করলেই ইথারের সাপেক্ষে বস্তুর আপেক্ষিক গতির হিসেব করে ফেলা যাবে। কিন্তু না, তা হয়নি। কেন? এই পর্বে আমরা সেই গল্পই শুনব।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রশ্নটা ছিল ইথারের সাপেক্ষে কোনও বস্তুর পরম গতি, ধরা যাক পৃথিবীর গতি, আমরা মাপব কীভাবে? উনিশ শতকের পদার্থবিদেরা ভাবতে শুরু করেছিলেন আলোর বেগের সঙ্গে পৃথিবীর গতিবেগের তুলনা করতে পারলেই এই কাজটা সেরে ফেলা যাবে। কিন্তু কীভাবে? সেই ব্যাপারটাই একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই আলো যে তরঙ্গ সেই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে শুরু করেছিলাম। পদার্থবিদেরা ভাবলেন জলের মধ্যে দিয়ে যেমন জলতরঙ্গ এগিয়ে যায় ঠিক সেরকমই আলোর তরঙ্গ এগিয়ে চলে ইথারের মধ্যে দিয়ে। তাতে ইথার মৃদু কম্পিত হলেও নিজের জায়গা ছেড়ে সরে যায় না। তার মানে এই ইথারের মধ্যে দিয়ে যেমন আলো এগোচ্ছে, আবার সেই ইথার সমুদ্রের মধ্যেই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। আমাদের কাজ হল এই দুই গতির মধ্যে তুলনা করা। আর সেই কাজটা সেরে ফেলার জন্য ততদিনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের হাতে এসে গেছে। সেটা হল, আলোর গতিবেগ তার উৎসের বেগের উপর কোনওভাবেই নির্ভর করে না। একটা চলন্ত গাড়ি থেকে একটা বলকে যদি গাড়ি যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলে ঐ বলের গতি অনেকটা বেশি বলে মনে হয়। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। উনিশ শতকের শেষে আর বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেটা বোঝা গিয়েছিল। উৎসের বেগ যাই হোক না কেন আলোর বেগ সবসময়েই সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। তাই যদি হয়, তাহলে স্থির অপরিবর্তনশীল ইথারের মধ্যে দিয়ে আলো যে নির্দিষ্ট বেগে (c) ছুটে চলে সেটাকেই আমরা পৃথিবীর পরম গতি নির্ণয়ের একটা মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিতে পারি। তার মানে আলো যেদিকে যাচ্ছে একজন দর্শক যদি সেদিকেই ছুটতে থাকেন তার কাছে আলোর বেগ c-এর থেকে বেশি। অর্থাৎ আলোর অভিমুখের সাপেক্ষে দর্শক কোন্ দিকে ছুটছেন তার উপরে নির্ভর করে আলোর বেগ পালটে যাবে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এই পরিবর্তন থেকেই তাঁরা পৃথিবীর পরম গতি হিসেব করে ফেলতে পারবেন।

তবে তার জন্য পদার্থবিদ্যায় আরও একটা ধারণার আমদানি করতে হল। সেটা হল 'ইথার বায়ু'। চলন্ত ট্রেনের কামরায় একজন যাত্রী যদি হাঁটতে থাকেন, তিনি ট্রেনের গতির দিকেই হাঁটুন বা উল্টো দিকে হাঁটুন, ট্রেনের সাপেক্ষে তার বেগ সবসময় একই থাকে। একটা বন্ধ গাড়ির ভিতরে শব্দতরঙ্গের গতিবিধিও সেরকম। শব্দ সামনের দিকেই যাক বা পিছনের দিকে যাক, বন্ধ গাড়ির ভেতরে তার বেগ পাল্টায় না। কিন্তু গাড়িটা যদি খোলা হয় সেখানে ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। বায়ু তখন আর গাড়ির মধ্যে আবদ্ধ নয়। গাড়ি যদি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে ছোটে তাহলে বায়ু ঐ একই বেগ নিয়ে পিছনের দিকে ছুটবে। সুতরাং, শব্দ যদি পিছন দিক থেকে সামনের দিকে আসে তার বেগ স্থির বায়ুতে যা বেগ হয় তার থেকে কম হবে; আর সামনের থেকে পিছনে গেলে তার বেগ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হবে। উনিশ শতকের পদার্থবিদেরা ইথারের বিষয়টাকেও ঠিক এভাবেই দেখতে চাইলেন। ইথার গতিহীন কিন্তু কোনও বস্তু যদি ইথারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে সে উল্টোদিকে 'ইথার বায়ু'তে একটা ধাক্কা খেতে থাকবে। আলোর ক্ষেত্রেও সেরকম হবে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী যেহেতু সেকেন্ডে তিরিশ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে, সেক্ষেত্রে পৃথিবীর গতির উল্টো দিকে যে ইথার বায়ুর সৃষ্টি হচ্ছে তার বেগও সেকেন্ডে তিরিশ কিলোমিটার। এই ইথার বায়ুর জন্যই আলো কোন্ দিকে যাচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে আলোর বেগ পাল্টে যাবে। বিভিন্ন দিকে আলোর এই আলাদা আলাদা বেগের তুলনা করতে পারলেই তাহলে কোনও একটা মুহূর্তে পৃথিবীর পরম গতি জানতে পারা যাবে। এই ভাবনাটাকে মাথায় নিয়েই স্কটল্যান্ডের প্রবাদপ্রতিম পদার্থবিদ জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৭৫ সালে প্রস্তাব দিলেন বিষয়টাকে যাচাই করে দেখার।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ হারম্যান ফন হেল্‌মহোলৎজ-এর গবেষণাগারে ১৮৮১ সালের এক সন্ধ্যায় মাইকেলসন যন্ত্রপাতি সাজালেন ইথার বায়ুর খোঁজে। কিন্তু মাইকেলসন অবাক হয়ে দেখলেন আলো যেদিকেই যাক না কেন তার বেগের কোনও পরিবর্তনই হচ্ছে না। খবরটা শুনে অস্ট্রিয়াজাত পদার্থবিদ আর্নস্ট ম্যাক একটা চেষ্টা করেছিলেন ইথারের ভাবনাটাকেই বাতিল করার কিন্তু বেশিরভাগ পদার্থবিদই তাতে রাজি হলেন না। তাঁরা ভাবছিলেন মাইকেলসনের যন্ত্রপাতিতেই হয়ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, আরও সুবেদী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে হয়ত বেগের পরিবর্তনটা ধরা যাবে। পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে মাইকেলসনও এরকমটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই নৌবাহিনীর

চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন ক্লিভল্যান্ডের কেস স্কুল অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স-এ ইথার বায়ুর সন্ধানে আরও উন্নত গবেষণার তাগিদে। সঙ্গী হিসেবে পেলেন পাশের ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক এডওয়ার্ড উইলিয়ামস মর্লেকে। ১৮৮৭ সালে মর্লের গবেষণাগারে শুরু হল আধুনিক পদার্থবিদ্যার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া মাইকেলসন-মর্লে পরীক্ষা।

গবেষণাগারে এক ফুট পুরু ও পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা বর্গাকার পাথরের খন্ডকে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে পারদের উপরে। উদ্দেশ্য পাথরখন্ডটা যাতে সবসময় অনুভূমিক অবস্থায় থাকতে পারে, আর কোনরকম কম্পন যাতে সেখানে না হতে পারে। পাথরখন্ডের উপর কিছু সমতল দর্পণ এমনভাবে রাখা আছে যাতে কোনও আলোকরশ্মি আটবার প্রতিফলিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট দিকে যেতে পারে। আলোকরশ্মিকে এভাবে বারবার প্রতিফলিত করানোর উদ্দেশ্য হল আলোর চলার পথটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া। ঠিক একইরকম ভাবে আটবার প্রতিফলিত করে আরও একটা আলোকরশ্মিকে পাঠানো হল প্রথম রশ্মির সমকোণে।

এবারে পাথর খন্ডটাকে এমনভাবে ঘোরানো হল যাতে একটা রশ্মি সমকোণে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে এরকম কোনও প্রভাব নেই। তাই ঐ একই দূরত্ব যেতে ঐ আলোকরশ্মির তুলনায় কিছুটা কম সময় লাগবে।

শেষ কাজ হল পরস্পর লম্ব ঐ দুটো রশ্মিকে এক জায়গায় মিশিয়ে দিয়ে পুরো ঘটনাটাকে টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। এরকম ক্ষেত্রে, যখন নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে একটা আলোক তরঙ্গ অন্য একটা তরঙ্গের ঘাড়ে এসে পড়ে তখন পর্দায় যে ছবিটা ফুটে ওঠে সেটা ভারী অদ্ভুত। ক্রমান্বয়ে আলো আর অন্ধকারের একটা প্যাটার্ন ফুটে ওঠে পর্দায়। পদার্থবিদ্যার ভাষায় এই ঘটনাকে বলা হয় ব্যতিচার। এই ব্যতিচারের ছবিটাই দেখতে চাইছিলেন মাইকেলসন আর মর্লে। বড় পাথর খন্ডটাকে যদি খুব অল্প অল্প করে ঘোরানো যায় তাহলে আলোকরশ্মি দুটোর আপেক্ষিক বেগ পাল্টাতে থাকবে, আর তার ফলে ঐ ব্যতিচার ঝালরও একটু একটু করে সরে যেতে থাকবে। দুই বন্ধু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন ঝালরের এই চলাচলের ছবিটাকে প্রত্যক্ষ করার আশায়।

কিন্তু না, কোনভাবেই ব্যতিচার ঝালরের সরণ ধরা পড়ল না মাইকেলসন আর মর্লের যন্ত্রে। মাইকেলসন হতাশ, তার সাথে সাথে সারা বিশ্বের পদার্থবিদেরাও হতবাক। হতাশাগ্রস্ত মাইকেলসন

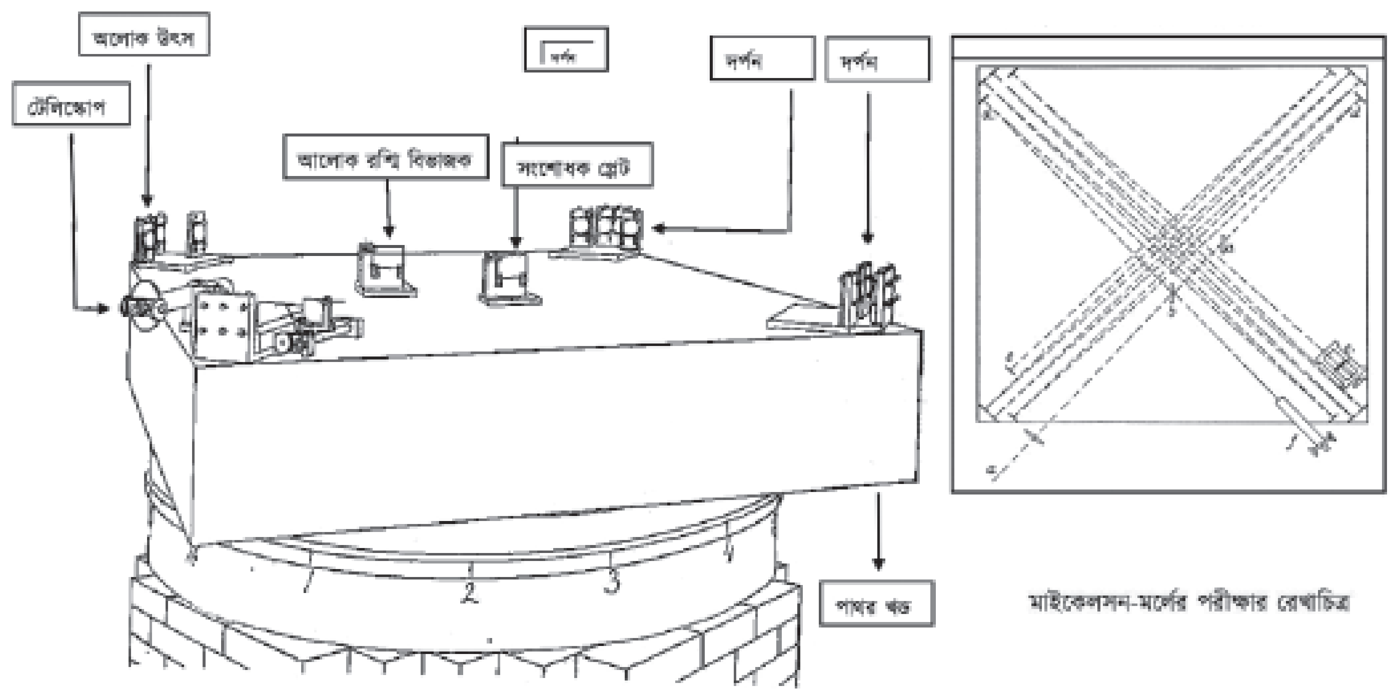

মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার রেখাচিত্র

ইথার বায়ুর অভিমুখের সমান্তরাল হতে পারে। তার মানে অন্য রশ্মিটা হবে ইথার বায়ুর অভিমুখের লম্ব। এক্ষেত্রে ইথার বায়ুর সমান্তরালে যে রশ্মি যাচ্ছে সে যখন সামনে এগোবে তখন তার বেগ বাড়বে। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আলোকরশ্মি যখন পিছনদিকে যাবে তখন তার বেগ কমবে কিছুটা বেশি সময় ধরে। ফলত, সহজ কিছু হিসেব-নিকেশ করলেই দেখা যাবে, ইথার বায়ু না থাকলে ঐ দূরত্ব যেতে আলোকরশ্মির যে সময় লাগত এক্ষেত্রে তার থেকে সময় কিছুটা বেশি লাগবে। অন্যদিকে যে আলোকরশ্মি ইথার বায়ুর সাথে

যন্ত্রপাতিগুলোকে আরও কিছুটা উন্নত করে আবার চেষ্টা করলেন ইথার বায়ুকে ধরার। নানান কায়দায় চেষ্টা চালালেন আরও কয়েকজন। কিন্তু কোনওভাবেই ইথার বায়ুর শীতল স্পর্শ আমরা পেলাম না। বেশ কিছুদিন পরে, ১৯৬০ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস টাউনেস ইথার বায়ুকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন অতি মাত্রায় সুবেদী এক যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্রে তিনি যে পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করেছিলেন সেটা এতটাই সুবেদী ছিল যে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ যদি প্রকৃত বেগের হাজার ভাগের এক ভাগ হত তাহলেও ঐ যন্ত্র

দিয়ে ইথার বায়ুকে ধরা যেত। কিন্তু ইথার বায়ু ধরা পড়েনি সেখানেও।

শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। ইথার তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার ব্যর্থতায় হতচকিত বিজ্ঞানী মহল খুঁজতে শুরু করলেন নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এমনকি, এই পরীক্ষার অনেক আগের একটা ধারণা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু হল। ভাবনাটা এইরকম; বন্ধ গাড়ির ভিতরে আবদ্ধ বাতাস যেমন গাড়ির সাথে সাথেই চলতে থাকে, ঠিক সেরকমভাবে পৃথিবীও তার চলার পথ ধরে ইথারকে টেনে নিয়ে যায়। মাইকেলসন নিজেই এরকম ভাবতে চাইছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, এমনকি মাইকেলসনের নিজের করা পরীক্ষাতেও, এই ভাবনাটা ভুল প্রমাণিত হয়। এই সময়কালের বর্ণনা দিতে গিয়ে জি. জে. হুইট্রো তার 'The Structure and Evolution of the Universe' বইতে মজা করে বলেছিলেন, মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষাটা যদি আরও বেশ কিছুদিন আগে হত, তাহলে হয়ত বিজ্ঞানীরা—পৃথিবী ঘুরছে না—এরকম একটা সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলতেন। তবে সব থেকে অদ্ভুত ধারণাটা এসেছিল আয়ারল্যান্ডের পদার্থবিদ জর্জ ফ্রান্সিস ফিৎসজেরাল্ড-এর কাছ থেকে। তাঁর মতে একটা গতিশীল বস্তুকে ইথার বায়ু যে চাপ দেবে তাতে গতির অভিমুখ বরাবর বস্তুটা দৈর্ঘ্যে কিছুটা ছোট হয়ে যাবে। স্থির অবস্থায় কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য l হলে, v বেগে গতিশীল অবস্থায় তার দৈর্ঘ্য হবে

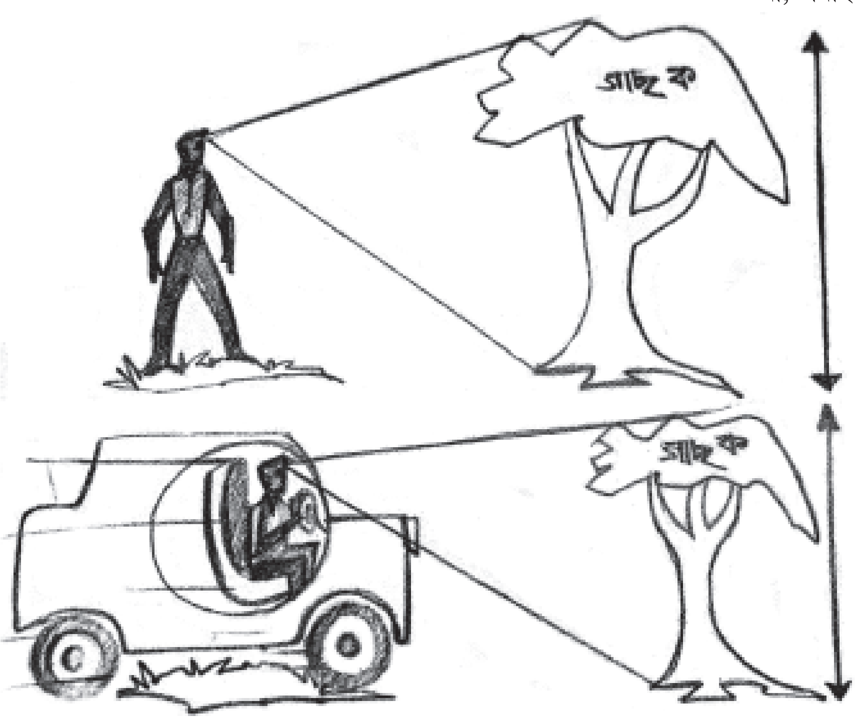

অর্থাৎ বস্তুর বেগ যত বাড়তে থাকবে তার দৈর্ঘ্যও তত কমতে থাকবে। আর বেগ বাড়তে বাড়তে যদি একেবারে আলোর বেগের সমান হয়ে যায় তখন তার দৈর্ঘ্য বলে আর কিছুই থাকবে না, শূন্য হয়ে যাবে। ভারী অদ্ভুত! ডাচ পদার্থবিদ হেনড্রিক অ্যান্টুন লোরেনৎসও এইভাবেই ভাবছিলেন। গণিতের ভাষায় সূত্রটাকে প্রকাশ করার কৃতিত্ব তাঁরই। তাই দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের এই সূত্রটাকে বলা হল লোরেনৎস-ফিৎসজেরাল্ড-এর সংকোচন তত্ত্ব।

কিন্তু ইথার বায়ুর চাপে বস্তুর দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া থেকে মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করব কীভাবে? তার উত্তর হল, ইথার বায়ু যেদিকে যাচ্ছে বর্গাকার পাথরের খন্ড আর তার উপরে বসানো সমস্ত যন্ত্রপাতি যদি সেই দিক বরাবর কিছুটা ছোট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত পথটা অতিক্রম করতে আলোর কিছুটা কম সময় লাগবে। এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঠিক ততটাই হবে যাতে ইথার বায়ু না থাকলে বা দৈর্ঘ্যের সংকোচন না হলে ঐ রাস্তা যেতে আলোর যতটা সময় লাগত এখনও ঠিক সেই সময়টাই লাগবে। অর্থাৎ যন্ত্রটাকে যেদিকেই ঘোরানো হোক না কেন আলোর বেগের কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল পৃথিবীর গতির অভিমুখ বরাবর যন্ত্রপাতির দৈর্ঘ্য যে কমে গেল সেই সংকোচনটাকে মাপা যাবে কি? অনেকেই ভাবছিলেন পৃথিবীর মাটিতে বসে এই সংকোচন মাপা যাবে না। কারণ, যে রুলার দিয়ে মাপব সেটাও তো ঐ একই অনুপাতে ছোট হয়ে যাবে। ইথার বায়ুর ধাক্কায় এই গতিশীল পৃথিবীর উপরের সবকিছুরই দৈর্ঘ্য কমবে। সুতরাং মাপলে দেখা যাবে যে আদৌ কোনও সংকোচন হয়নি। পৃথিবীর বাইরে থেকে (অবশ্যই পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থেকে) যদি এই সংকোচনটা মাপা যায়, তাহলেই একমাত্র সেটা বোঝা যেতে পারে।

না, সবাই যে ঠিক এরকমই ভাবছিলেন তা নয়। যেমন হেনড্রিক লোরেনৎস। তিনি বেশ জোর দিয়েই বলতে চাইছিলেন যে, দৈর্ঘ্যের সংকোচন মাপা সম্ভব এবং সেই পরিমাপ থেকে শেষ পর্যন্ত মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার মত ফলাফলই পাওয়া যাবে। সেই ভাবনাটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি সংকোচন তত্ত্বে জুড়ে দিলেন নতুন একটা বিষয়—সময়ের সংকোচন। অর্থাৎ ইথার বায়ুর ধাক্কায় ঘড়িও চলবে আস্তে আস্তে, ফলে আলোর বেগের কোনও পরিবর্তন হবে না।

ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, পৃথিবীর গতিপথ বরাবর A বিন্দু থেকে B বিন্দু পর্যন্ত যেতে আলো কতটা সময় নিচ্ছে তা দেখে আলোর বেগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। A বিন্দুতে দুটো ঘড়িকে মিলিয়ে নিয়ে একটা ঘড়িকে B বিন্দুতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। A বিন্দু থেকে আলো কখন রওনা হল আর ঐ আলো কখন B বিন্দুতে এসে পৌঁছল সেটা ঐ দুই জায়গার ঘড়ি দেখে নোট করে নেওয়া হল। এখানে আলো যেহেতু ইথার বায়ুর বিপরীতে যাচ্ছে তাই তার বেগ কিছুটা কম হবে, অর্থাৎ বায়ু না থাকলে A থেকে B বিন্দুতে যেতে আলোর যা সময় লাগত তার থেকে কিছুটা বেশি সময় লাগবে। কিন্তু A থেকে B বিন্দুতে যাওয়ার পথে ঘড়িও তো (যে ঘড়িটা B বিন্দুতে রাখা আছে) ইথার বায়ুর বিপরীতে গেছে।

সুতরাং লোরেনৎস-এর ভাবনা অনুযায়ী A বিন্দুর ঘড়ির তুলনায় B বিন্দুর ঘড়ির কিছুটা পিছিয়ে পড়ার কথা। সুতরাং, আলোর বেগ ঐ একই থাকবে, সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। B বিন্দু থেকে A বিন্দুতে আলো পাঠিয়ে যদি তার বেগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হত তাহলেও কিন্তু রেজাল্টে কোনও হেরফের হত না। সেক্ষেত্রে B বিন্দুতে দুটো ঘড়ি মিলিয়ে একটাকে A বিন্দুতে নিয়ে আসতে হত। আর তাতে ইথার বায়ুর অভিমুখ বরাবর চলার কারণে A বিন্দুর ঘড়ি B বিন্দুর ঘড়ি থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকত।

লোরেনৎস-এর এই নতুন তত্ত্ব শুধু যে মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার রেজাল্টকে সমর্থন করছে তা-ই নয়। এখানে দৈর্ঘ্য আর সময় পরিবর্তনের সূত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে, আলোর বেগ পরিমাপের যেকোনও পরীক্ষাতেই একই রেজাল্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু পদার্থবিদদের কাছে এই তত্ত্ব খুব একটা মনঃপূত হল না। তাঁদের মনে হল ইথার তত্ত্ব আমদানি করার ফলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল, লোরেনৎস-এর তত্ত্ব যেন সেগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা। ইথার যদি থেকে থাকে তাকে আড়াল করে রাখার জন্য প্রকৃতি এইভাবে দৈর্ঘ্য আর সময়ের পরিবর্তন করে নেবে, পদার্থবিদেরা এটা ঠিক বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। অথচ বিষয়টাকে মেনে নেওয়া বা বর্জন করার মত কোনও অকাট্য প্রমাণও তাদের কাছে ছিল না। আবার এর থেকে আরও ভালো কোনও বিকল্পও সেসময়ে তাঁদের হাতে ছিল না। পদার্থবিদ্যা এসে দাঁড়াল এক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি।

(চলবে)

স্কেচ ঃ সৌরভ মুখার্জী

email:anindya05@gmail.com • M. 9432220412

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ত প ন দা স

বন্ধু যখন শত্রু

বেঁচে থাকার অপরিহার্য দুটি উপাদান—জল ও অক্সিজেন। পরিবেশের এই দুই উপাদান ছাড়া জীবের বেঁচে থাকা অকল্পনীয়। কিন্তু জানেন কি এই দুই বন্ধু মাঝে মাঝে কিভাবে আমাদের শত্রু হয়ে যায়? বালুরঘাটের বন্ধু বিমান প্রশ্ন করেছিল তোমাদের কোচবিহার শহরের অনেক বাড়িতেই গেছি কিন্তু কোন বাড়িতেই দেয়াল আলমারি দেখতে পাইনি। কিন্তু আমাদের দিকে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেয়াল আলমারি লক্ষ করা যায়। এর কারণটা কি? আবার প্রশ্ন করেছিল, কোচবিহারের রাজবাড়িতে দেখলাম অনেক জিনিসই অক্ষত। কিন্তু রাজ আমলের পেইন্টিংগুলো প্রায় অবলুপ্ত। এগুলোকে উদ্ধার করার কাজে আরকিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় কর্মরত রসায়নবিদ বন্ধু দীপক এসেছে কলকাতা থেকে। এই পেইন্টিংগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ারই বা কারণ কি? উত্তরে জানালাম বন্ধুর শত্রুতা। অপেক্ষাকৃত বেশি আর্দ্রতাযুক্ত বায়ুর কারণে এখানে ঘরের দেওয়াল নোনা ধরার প্রবণতা অনেক বেশি। শুধু তাই নয় বর্ষাকালে ঘরে থাকা জামাকাপড়েও ছাতা পড়ে যায়। এরও কারণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের আধিক্য। জলীয়বাষ্পের এই শত্রুতা থেকে বাঁচতে হয়ত রাজ আমলের ঘরবাড়ি চুনশুরকির তৈরি হত যাতে যাতে বিল্ডিংগুলো কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার আর্দ্র আবহাওয়ায় পুরনো কাগজপত্র, বইপত্রের রঙ সাদা থেকে হলুদ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। এর পিছনে শত্রুতা করে অক্সিজেন। কাগজে থাকা সেলুলজের মুখ্য উপাদান লিগনিন যা পলি হাইড্রোক্সি যৌগ। বায়ুতে থাকা অক্সিজেন লিগনিনে প্রবেশ করে লিগনিনকে নতুন যৌগে পরিণত করে। রসায়নের ভাষায় উৎপন্ন নতুন যৌগকে বলে এক ধরনের ক্রোমোফোর অর্থাৎ রঙ বহনকারী পদার্থ। তাই পুরনো কাগজপত্র রঙিন হয়ে যায়। আবার তৈলচিত্রে থাকা লেড যৌগ বাতাসের সালফারের সাথে বিক্রিয়ায় লেডসালফাইড-এ পরিণত হয়। ফলে এটি কালো হয়ে যায়। এইসব জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য বায়ু নিরুদ্ধ স্থান উপযুক্ত। অথবা নাইট্রোজেনপূর্ণ আবহাওয়ায় রাখলেও অক্সিজেনের আক্রমণ হবে না। যদিও গবেষকরা উন্নত মানের কাগজ বানাচ্ছেন যাতে লিগনিনের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে কম। আমরা আশাবাদী অচিরেই আমরা আমাদের জিনিসপত্র সহজেই সংরক্ষণ করতে পারব।

email : tdcob25@gmail.com • M. 9434686749

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিম মানুষের ঘরবাড়ি

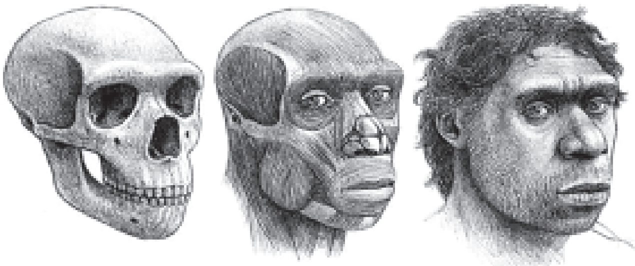

পৃথিবীতে মানুষ এসেছিল প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে। এরা দেখতে আমাদের মত ছিল না। আকারে ছিল অনেক বড়। হাত দুটো ছিল লম্বা—হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। কপালের হাড় ছিল নীচু। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটত। অনেকটা বড় বানরের মত দেখতে। তবে বুদ্ধি ছিল বানরের চেয়ে কিছুটা বেশি। এই যুগের মানুষকে বলা হয় 'নিয়ান্ডার্থাল'। এর পরে মানুষ অনেক বদলে গেছে। পরের পর্বের মানুষকে বলা হয় 'হোমো স্যাপিয়েন্স'। আমরা এদেরই ধারা। এদের মগজ আরও উন্নত ছিল। তবে এখনকার মানুষের মত নয়।

আদিম মানুষ ছিল বন্য। পশুদের মতই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এক জঙ্গলের খাবার ফুরিয়ে গেলে অন্য জঙ্গলে চলে যেত। তবে মগজে বুদ্ধি থাকায় সেটাকে কাজে লাগিয়ে সবসময় চেষ্টা করত উন্নত জীবনযাপনের পথ খুঁজে বের করতে। আদিমকালে মানুষের মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই ছিল না। হিংস্র পশুর আক্রমণের ভয়, ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজার ভয়, হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কষ্ট পাওয়ার ভয় সবসময় তাদের তাড়া করে বেড়াত। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে ঘুরতে তারা লক্ষ করল পাহাড়ের গায়ে ছোট, বড় অনেক গুহা আছে। সেখানে থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যেমন বাঁচা যায় তেমন হিংস্র পশুর আক্রমণ অনেক সহজে মোকাবিলা করা যায়। কারণ তখন চারদিকে দৃষ্টি রাখার বদলে একদিকেই দৃষ্টি রাখলেই হয়। অতএব গুহাই হল মানুষের আদিম বাসস্থান।

গুহা কিন্তু মানুষের বাসস্থানের সমস্যা পুরোপুরি মেটাতে পারল না। পার্বত্য এলাকায় গুহা পাওয়া গেলেও সমতলের গভীর জঙ্গলে

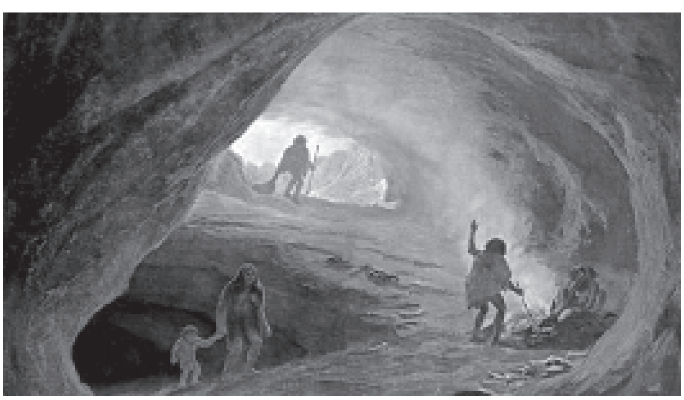

তো গুহা পাওয়া যায় না। তাহলে তারা থাকবে কোথায়? এছাড়াও মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় গুহার অভাব দেখা দিল। কাজেই তখন সে নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই নিজেই তৈরি করার কথা ভাবতে শুরু করল। কিন্তু কীভাবে? সে তো শুধু পাথর চেনে। অতএব পাথরকেই তারা বাড়ি তৈরির উপাদান হিসেবে প্রথম বেছে নিল। বড় বড় পাথর নীচে দিয়ে তার উপর অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে মানুষ তৈরি করল নকল গুহার মত এক ধরনের আশ্রয়স্থল। এগুলি দেখতে হত উল্টানো মৌচাকের মত। ভিতরে ঢোকার জন্য দরজার মত একটা ফোকর থাকত। জানলা-টানলা কিছু থাকত না। ফলে ভিতরে কোন আলো ঢুকত না। ফলে বাসার ভিতরে ঢুকলে রাত না দিন কিছুই বোঝা যেত না। রাতে ঘুমানোর সময় হিংস্র পশুর আক্রমণ ঠেকাতে দরজার সামনে একটা বড় পাথরের চাঁই বসিয়ে রাখত। সকালে তা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত। এই ধরনের আশ্রয়স্থলকে বলা হয় 'বি-হাইভ-হাট'। মানুষ দেখল পাথরগুলি গোলাকার না সাজিয়ে যদি চৌকো আকারে সাজানো যায় তাহলে ঘরের ভিতরের জায়গা অনেক বেশি পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ঘরের ছাঁদ ঢাকার জন্য তারা শিকার করা পশুর দেহের চামড়া বা গাছের বড় বড় পাতা ব্যবহার করতে

শুরু করল। এইভাবে মানুষ বাসা বানানোর জন্য পাথর ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার শিখল। মানুষের তৈরি স্থাপত্যের প্রথম পদক্ষেপ।

পাহাড়ের কাছাকাছি যারা থাকত তাদের পক্ষে পাথর দিয়ে বাসা বানানোর সুবিধা ছিল। কিন্তু যারা পাহাড় থেকে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলে থাকত তাদের পক্ষে দূর থেকে ভারী পাথর বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তারা বাসা বানানোর জন্য অন্য উপকরণের কথা ভাবতে শুরু করল। জঙ্গলে গাছ প্রচুর। তাই তারা বাসা বানাল ছোট ছোট গাছ ও গাছের ডাল দিয়ে। মানুষ ততদিনে আগুনের ব্যবহার ও পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাতে শিখে গেছে। এই অস্ত্রকেই সে কাজে লাগাল। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে, মাটি খুঁড়ে, কেটে আনা গাছগুলো গোলাকার করে পুঁতে দিল। এরপর গাছের মাথাগুলিকে এক জায়গায় টেনে এনে বেঁধে দেওয়া হল। তৈরি হল বাসার কাঠামো। গাছের বড় বড় পাতা বা পশুর চামড়া দিয়ে কাঠামোর গা ঢেকে দিয়ে তৈরি হল নতুন এক ধরনের বাসা। বড় ঝুড়ি উল্টো করে বসিয়ে দিলে যেমন দেখতে হয় এই গোলাকার বাসাগুলি দেখতে তেমনই হল। এক্ষেত্রেও বাসায় বা ঘরে ঢোকা বা বেরোনোর জন্য শুধু একটি দরজা থাকত, কোন জানলা থাকত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হিংস্র পশুর

আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোই তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জানলার ধারণা তখনও তাদের মাথায় আসেনি। যাই হোক, অন্য এক উপায়ে বাসা তৈরি করতে তো মানুষ শিখল?

এই প্রসঙ্গে অন্য আরেক ধরনের বাসার কথা বলি। পশু শিকার করে মানুষ তার মাংস খেত। চামড়াটা শুকিয়ে নিয়ে নিজেদের গা ঢাকার কাজে লাগাত। হাড়গোড়গুলো ফেলে দিত। এক সময় তারা লক্ষ করল যে এই হাড়গোড়গুলো জলে ভিজলেও সহজে নষ্ট হয় না। মাথায় এল বাসা বানানোর অন্য এক চিন্তা। শিকার করা পশুর হাড়, শিং, চামড়া, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হল নতুন এক

ধরনের বাসা। এগুলিও দেখতে উল্টো করে বসানো গোলাকার ঝুড়ির মত হত। মস্কোর ইতিহাসের জাদুঘরে এরকম একটা ঘরের ছাঁচ আছে।

প্রথমদিকে গোলাকার বাসা বানানোর প্রবণতা বেশি ছিল। পরে অবশ্য বর্গাকার বা আয়তাকার বাসা বানানোর দিকে মানুষ বেশি ঝুঁকে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে বাসার উপরের ছাউনিটা অনেক বড় করতে হয়। প্রথমে একচালা পরে দোচালা, চারচালার প্রবর্তন হয়। ঘরের দেওয়ালও অনেক বড় হওয়ায় সেগুলো শক্তপোক্ত করার জন্য মাটির প্রলেপ লাগান হয়। এধরনের বাড়ি এখনও গ্রামেগঞ্জে দেখতে পাওয়া যায়।

জল ছাড়া তো বাঁচা যায় না। তাই মানুষ চেষ্টা করত কাছাকাছি কোন জলের উৎস আছে এমন জায়গায় থাকতে। তবে শিকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। কিছু মানুষ লক্ষ করল বড় বড় জলাশয়ে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। ডাঙার অন্যান্য শিকারের মত তা চট করে ফুরিয়ে যায় না। দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকা যায়। যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসবাসের ভাবনা মানুষের মাথায় এল। এরা হ্রদের জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুঁতে তার উপর ঘর বানাল।

লিওনিথিক আমলের মানুষ কৃষিকাজ জানত। এরা সাধারণত মাটির ঘর বানিয়ে বসবাস করত। এরা দল বেঁধে থাকত। ফলে গ্রামের ধারণা তখন এসে গিয়েছিল। এই সময়ে হ্রদের কাছাকাছি যারা থাকত তারা জলের উপর কাঠের বাসা বানাত। এই হ্রদবাসীরা কর্মঠ ও কর্মকুশল জাতি ছিল। এরা মাছ শিকারের পাশাপাশি পশু পালনও করত। ১৮৫১-৫৪ সালের শীতকালে জুরিক হ্রদের জল অস্বাভাবিক কমে যায়। সেই সময় এই হ্রদের তীরে অপ্রত্যাশিতভাবে খুঁজে পাওয়া যায় পুরো একটি প্রাগৈতিহাসিক নিওলিথিক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। পরীক্ষা

করে দেখা গেছে, এই প্রাগৈতিহাসিক আমলের সুইস হ্রদবাসীরা জলের উপর বাসা বানাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সুইজারল্যান্ডের নিউ শাতেল হ্রদে প্রায় পঞ্চাশটা এরকম হ্রদ-বসতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নিউগিনি এলাকাতেও নিওলিথিক হ্রদবাসীদের এই ধরনের বাসা বানানোর কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আদিম যুগের মানুষেরা ছিল যাযাবর। যেখানে যতদিন খাবার পাওয়া যেত ততদিন সেখানেই থাকত। খাবার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। ফেলে রেখে যেত লতাপাতা দিয়ে বানানো বাসা। নতুন জায়গায় আবার তারা নতুন বাসা বানাত। আগের বাসাটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে কালের নিয়মে নষ্ট হয়ে যেত। চাষবাস শেখার পর মানুষের জীবনের ধারাটাই পাল্টে গেল। যাযাবর জীবন ছেড়ে তারা স্থায়ী বসবাসের কথা ভাবতে শুরু করল। ততদিনে তারা আরও অনেকটা সভ্য হয়েছে। আগুনের ব্যবহার শিখেছে। গোরু, ঘোড়ার মত পশুকে পোষ মানাতে পেরেছে। সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

স্থায়ী বসবাসের জন্য দরকার শক্তপোক্ত বাসা। লতাপাতা দিয়ে বানানো বাসা বেশিদিন টেঁকে না। ঝড়জলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে বাসা টেকসই করা যায়, ভাবতে ভাবতে একদিন মানুষ গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো বাসার দেওয়ালে মাটি লেপে দিল। বাঃ, ঝড়জলে তো বাসা তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে না? তাহলে মাটি দিয়ে বানানো বাসা আরও অনেক টেকসই হবে? শুরু হল মাটি দিয়ে বাসা তৈরি। ছাদের ছাউনি দিতে গাছের পাতার বদলে ব্যবহার হল খড়। মানুষ তখন ধান ফলাতে শিখে গেছে। জল যাতে তাড়াতাড়ি গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে পারে তাই চালে ঢাল রাখা হল। প্রথমে একদিকে, হল একচালা ঘর। পরে দুদিকে বা চারদিকে ঢাল রেখে মানুষ তৈরি করল দোচালা বা চারচালা ঘর। দেওয়াল মাটির হওয়ায় ঝড়জলের সময় জলের ঝাপটা বা শীতকালে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতে পারল না। এধরনের বাড়ি এখনও আমরা গ্রামেগঞ্জে দেখতে পাই। সাধারণভাবে এগুলিকে আমরা কুঁড়েঘর বলে থাকি। এই ধরনের মাটির বাড়ি শুধু যে একতলা হয় তা নয়, দোতলাও হয়। ঘরের ভিতরে যাতে আলো, বাতাস খেলতে পারে তাই জানলাও বসান হল। এভাবেই শুরু হল মানুষের স্থায়ী বাসা বানানোর প্রথম প্রচেষ্টা।

email:kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

অ মি তা ভ চ ক্র ব র্ত্তী

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য থেকে তৈরি হবে 'ডায়মন্ড ব্যাটারি'

বাজার থেকে কিনে আনা 'নির্জল কোশ' বা ড্রাই সেল-এর ব্যবহার তো সেই কত কাল থেকেই হয়ে আসছে। একবার ফুরিয়ে গেলেই ফেলে দিতে হয় সেগুলিকে। তবে ইদানিং রিচার্জেবল ব্যাটারির কল্যাণে নির্জল কোশের ব্যবহার খানিকটা কমেছে বইকি। অন্তত টর্চ, ছোটদের খেলনা, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে প্রায় সবরকম ইলেকট্রনিক যন্ত্র-পাতিতেই আজকাল বিভিন্ন রকমের রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা পেসমেকারের মত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলিতে এখনও রিচার্জেবল ব্যাটারির আওতার বাইরে। তাই এসবের জন্য আমরা আজও খুঁজে বেড়াই দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী কোন তড়িৎকোষ। শুরুটা হয়েছিল কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই। এই গবেষণার সূত্র ধরেই বিজ্ঞানীরা বানিয়েছিলেন 'ডায়মন্ড ব্যাটারি'। সম্প্রতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন প্রজন্মের ডায়মন্ড ব্যাটারি তৈরি করেছেন ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। তাদের দাবি এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার সম্ভব হবে। আর পরমাণু চুল্লি মানেই তো বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের উৎস। এমনকি আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া চুল্লিগুলিতেও বর্জ্য হিসাবে থাকে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিশেষত সেখানে ব্যবহৃত গ্রাফাইট ব্লকগুলিতে যাকে কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ C^{14}। সেখান থেকে এদেরকে আলাদা করেই কাজে লাগানো হয় ডায়মন্ড ব্যাটারিতে। আসলে এই ব্যাটারিগুলিতে তেজস্ক্রিয় কার্বন একটি পাতলা অতেজস্ক্রিয় ডায়মন্ডের স্তর দিয়ে ঢাকা থাকে বলেই এদের এমন নাম। সর্বোপরি তেজস্ক্রিয়তা এই ব্যাটারিগুলির চালিকাশক্তি হওয়ায় এদের কার্যকারিতা প্রায় অসীম বলেই গবেষকদের দাবি। মহাকাশযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পেসমেকার ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এই ব্যাটারি উপযোগী। এমনকি অত্যন্ত উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার চরম পরিবেশেও কার্যসম্পাদনে সক্ষম ডায়মন্ড ব্যাটারি। ইংল্যান্ড নিবাসী গবেষকরা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ২০৩০ সাল নাগাদ শুধুমাত্র তাদের দেশেই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষ টন। গোটা বিশ্বের নিরিখে এই পরিমাণ যে কি বিপুল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই দূষণ ও আসন্ন শক্তি সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে এই নতুন গবেষণা এখন বিজ্ঞানীদের আশার আলো দেখাচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

শব্দজব্দ

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

শাঁখের যে দিকটায় ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় সেই দিকটা কানে লাগিয়ে দেখেছেন কখনো? মনে হয় যেন সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বলতে পারেন কেন এটা হয়? আসলে চারপাশের সব রকমের শব্দ, এমনকি বাতাসের মৃদুমন্দ শব্দও, যখন শাঁখের ভিতর দিয়ে যায় তখন সেই শব্দশক্তির ধাক্কায় শাঁখের ভিতরের বায়ু অনুনাদী কম্পাঙ্কে (সেই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক যেখানে পৌঁছলে কোনও মাধ্যম সর্বোচ্চ হারে শক্তি ছড়িয়ে দিতে পারে) পৌঁছে যায়। কম্পাঙ্কের এই ওঠা-নামার কারণেই সমুদ্রের ঢেউয়ের আসা-যাওয়ার মত শব্দ শোনা যায়।

M. 8961401423

জয়শ্রী দত্ত

প্রাণীজ রঙের ইতিহাস ও ব্যবহার

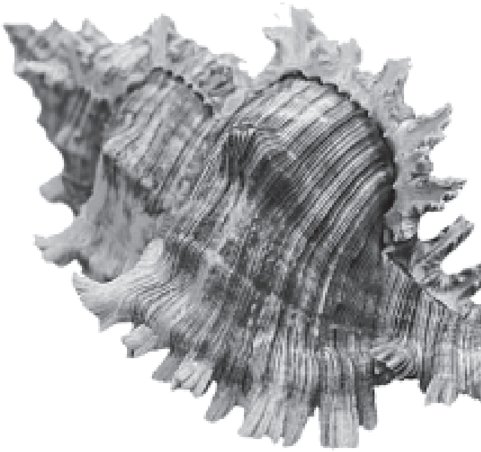

পোকামাকড়, শামুক ইত্যাদি অমেরুদন্ডী প্রাণী থেকে রঙ তৈরি করে তা দিয়ে কাপড় রঙ করার ইতিহাস বহু প্রাচীন, যীশুখ্রিস্টের জন্মেরও আগে।

১৫৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফিনিশীয় অঞ্চলগুলোতে টাইরিয়ান পার্পল নামে উজ্জ্বল লালচে বেগুনী রঙ পাওয়া যেত কাপড় রঙ করার জন্য। মিউরিসিডি গোত্রের (Family-Muricidae) বেশ কয়েক প্রজাতির শামুক থেকে এই রঙটা পাওয়া যেত। রঙ তৈরির জন্য সংগ্রহ করতে হত হাজার হাজার শামুক, রঙ তৈরির পদ্ধতিও ছিল জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য। টাইরিয়ান পার্পলের মূল রাসায়নিক উপাদান হল 6, 6 ডাইব্রোমোইন্ডিগো। সামুদ্রিক শামুকগুলো আঘাত পেলে বা শত্রুর আক্রমণে আক্রান্ত হলে ডাইব্রোমোইন্ডিগো সম্পৃক্ত রস নিঃসরণ করতে থাকে। রঙটা আসলে ব্রোমিনের জৈবযৌগ। এবিষয়ে ডেভিড জ্যাকবির লেখা থেকে জানতে পারি মিউরেক্স গণের বারো হাজার শামুক থেকে মাত্র ১.৪ গ্রাম পরিশুদ্ধ রঙ পাওয়া যেত। এর থেকে বোঝা যায় কি বিপুল পরিমাণ শামুক ধ্বংস করা হত সামান্য পরিমাণ রঙের জন্য।

এই রঙের চাহিদার মূল কারণ ছিল এর ঔজ্জ্বল্য। অন্যান্য প্রাকৃতিক রঙ যেখানে রোদের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে তাদের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে, এই রঙ সেখানে রোদের আলোয় আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতকে ঐতিহাসিক থিওপম্পাস লিখেছিলেন এশিয়া মাইনের অঞ্চলে টাইরিয়ান পার্পল রঙ সমান ওজনের রূপোর দামে বিক্রি হত। এই রঙে রাঙানো কাপড় অভিজাত পদমর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমনই মূল্যবান আর একটি রঙ হল ক্রিমসন কারমেস। এটা পাওয়া যায় কারমেস ভারমিলো *(Kermes vermillo)* নামে এক ধরনের পোকার শুকনো মৃতদেহ থেকে। শুকনো মেয়ে পোকার মৃতদেহ থেকেই এই রঙ সংগৃহীত হত। এই পোকাগুলো বাসা বাঁধে কারমেস নামে এক বিশেষ প্রজাতির ওক গাছে। ঐ গাছটার বিজ্ঞানসম্মত নাম কোয়ারকাস কক্কিফেরা *(Quercus coccifera)*। গাছটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। শুকনো মেয়ে পোকাগুলো থেকে যে উজ্জ্বল লাল রঙ পাওয়া যেত তা ব্যবহার করা হত রেশম ও পশমের কাপড় রঙ করার জন্য।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, সিসিলি ইত্যাদি অঞ্চলে এই লাল রঙে রাঙানো রেশম ও পশমের বস্ত্র হয়ে উঠেছিল নতুন এক অভিজাত পদমর্যাদার প্রতীক।

এখন এইসব প্রাণীজ উপাদান থেকে আর রঙ তৈরি হয় না। এখন বেশিরভাগ প্রাকৃতিক রঙই তৈরি করা হয় উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে।

email: jayashree.datta@yahoo.co.in • M. 9831060548

With Best Compliments :

✆ 9083892273

M/S SAHA ENTERPRISE

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Prop. Netai Saha

Vill & P.O. Simhat

(4 No. Gate near BSF Camp)

District : Nadia PIN : 741249

মনতোষ মিত্র

মৌলিকত্ব

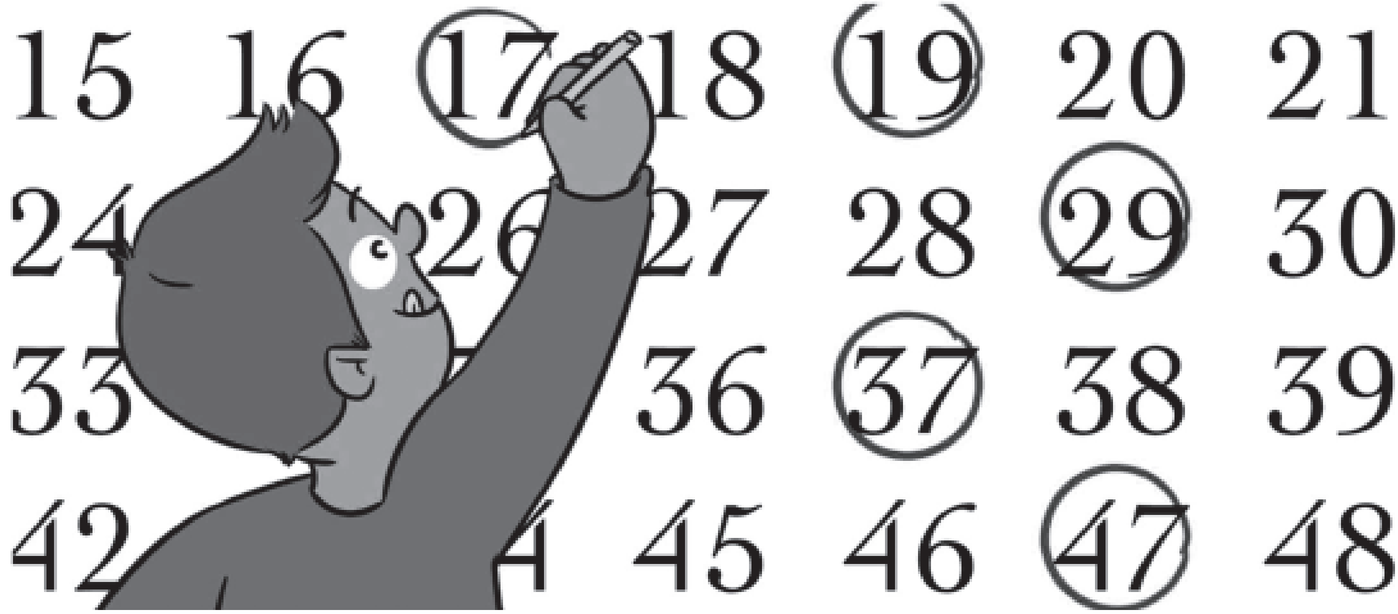

সেদিন ছিল পাপানের ছুটির দিন। আর ছুটির দিন মানেই বিভিন্ন প্রশ্নের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। বলতে বলতেই পাপান এসে হাজির। একগাল হাসিমুখে প্রণাম সেরেই বলল—কেমন আছেন স্যার। বললাম—ভালই আছি। বিভিন্ন স্কুলে গণিতের সেমিনার করে বেড়াচ্ছি। আর তোমাদের মত কচিকাঁচাদের সঙ্গ লাভ করছি। খুব ভাল আছি। তোমরা কেমন আছো—বলো। পাপান কোন উত্তর না করে বলল—স্যার একটা টিউশন পড়াই। কিছু হাতখরচ যেমন আসে, পাশাপাশি অজানা বহু কিছু নতুন করে জানতে পেরে খুব ভাল লাগে। কথা শেষ হতেই পাপান বলে উঠল—স্যার, আমার ছাত্রটি মৌলিক সংখ্যা নিয়ে বহু প্রশ্ন করে। চেষ্টা করি সাধ্যমত উত্তর করার। কিন্তু কোথায় যেন একটু ঘাটতি থেকে যায়। এই মৌলিকত্ব নিয়ে যদি কিছু বলেন তো খুব ভাল হয়। বললাম—বোসো আগে। কিছু মুখে দাও। তারপর সব বলা যাবে। বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। যেন তৃষ্ণার শান্তি। বলতে বলতেই পাঁপড় ভাজা আর চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে বললাম—পাপান, মৌলিক সংখ্যায় যাওয়ার আগে মৌলিক ব্যাপারটা অনুভব করতে হবে। মৌলিক ব্যাপারটি কেবল সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মৌলিক পদার্থের কথা রসায়নে পড়োনি? চিন্তনে মৌলিকত্ব আছে। ধারণায় মৌলিকত্ব আছে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে যেমন পদার্থের মৌলিকত্বের ধারণা দেওয়া হচ্ছে। প্রাণীবিজ্ঞানেও প্রাণের মৌলিকত্বের ধারণা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ধারণাগুলো এত বিক্ষিপ্তভাবে বিষয়ভিত্তিক করে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে যার ফলস্বরূপ মৌলিকত্বের ধারণা বিষয়ের ভিতর সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। দেখো পাপান মৌলিক কথাটি যখনই বিজ্ঞানের একটি শাখার সাপেক্ষে ব্যাখ্যায়িত হয় তখনই সেই শব্দের অন্তর্নিহিত অনুভব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এবার প্রসঙ্গে আসি। গণিতের প্রেক্ষিতে যখন প্রশ্ন করা হয়—মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে? তখন উত্তরও সংখ্যার সাপেক্ষে বিবৃত হয়। যেমন মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞায় বলা হয়—এক অপেক্ষা বৃহত্তর যে সকল সংখ্যার এক (১) বা ওই সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন গুণনীয়ক থাকে না, তাদের মৌলিক সংখ্যা বলে। ইংরেজিতে বলে প্রাইম নাম্বার (Prime number)। দেখো পাপান—এক অপেক্ষা বৃহত্তর বললাম কেন? কারণ, এক অপেক্ষা বৃহত্তর, এর বিপরীতে ঋণাত্মক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শূন্য (০) বা এক (1)। এই শূন্য আর এক হল, পদার্থগুলির আদি অবস্থায় যে এলিমেন্টারি পারটিক্যাল এর অস্তিত্ব ছিল, যা থেকে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে ঠিক তেমনই ভূমিকা হল শূন্য (০) আর এক (1) এর। সংখ্যা জগতের এই আদি সত্তার সমন্বয়ে সৃষ্ট যাবতীয় সংখ্যার সাম্রাজ্য। এক (1) থেকে দশ (10) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল—2, 3, 5, 7। মোট চারটি, এগার (11) থেকে কুড়ি (20) এর ভিতর পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হল—11, 13, 17, 19। মোট চারটি। একুশ (21) থেকে তিরিশের ভিতর (30) পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হল—23 ও 27। মোট 2টি। একত্রিশ (31) থেকে চল্লিশ (40) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল—31 ও 37। মোট দুটি। একচল্লিশ (41) থেকে পঞ্চাশের (50) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল—41, 43, 47। মোট তিনটি। একান্ন (51) থেকে ষাট (60) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল—53, 59। মোট দুটি। একষট্টি (61) থেকে সত্তর (70) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল—61 ও 67। মোট দুটি। একাত্তর (71) থেকে আশি (80) এর ভিতর মৌলিক সংখ্যা হল 71, 73, 79। মোট তিনটি। একাশি (81) থেকে নব্বই (90) পর্যন্ত। মৌলিক সংখ্যা হল—83, 89। মোট 2টি। আর একানব্বই (91) থেকে একশ (100) পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হল—97। মাত্র একটি। এক থেকে একশ পর্যন্ত রাশিগুলিকে এক থেকে দশ। আবার এগার থেকে কুড়ি—এইভাবে

মোট দশটি পর্বে বিভাজিত করলে প্রতিটি পর্বে মৌলিক সংখ্যা থাকবে যে কয়টি, তার হল যথাক্রমে 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। এই 44223 সংখ্যাটিকে একটি জরুরী মোবাইল নাম্বার হিসাবে মনে রাখলে অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উত্তর খুব সহজেই দেওয়া যায়। যেমন, এক থেকে একশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলির সমষ্টি কত? এর উত্তর হল এক হাজার ষাট বা 1060 বা এক থেকে একশ পর্যন্ত মোট কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে বা এদের গড়ই বা কত? একশটা উত্তর হল 4+4+2+2+3+2+2+3+2+1। মোটি 25টি। দ্বিতীয়টির উত্তর হল— গড় 42.4। ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যাটি কি? উত্তর হল 2 (দুই)। যা একমাত্র জোড় বা যুগ্ম সংখ্যা। এ ছাড়াও বহুরকম প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন চল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত সেই মৌলিক সংখ্যা কয়টি? এর উত্তর ঐ মোবাইল নম্বর থেকে সংগ্রহ করা যায়। যেমন 2+3+2 = 7টি। আবার এভাবেও প্রশ্ন করা যেতে পারে চল্লিশ থেকে আশি পর্যন্ত। সংখ্যার ভিতর বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত? এর উত্তরে বলি—বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা হল—79 এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা হল—41। অতএব অন্তর হল 79 – 41 = 38। আবার এখন প্রশ্নও করা যেতে পারে দশ থেকে 60 পর্যন্ত যে সকল মৌলিক সংখ্যার একক অবস্থানে 9 আছে তাতে সমষ্টি কত? উত্তর হবে—19+29+59 = 107।

এই পর্যন্ত হলে পাপানের দিকে তাকিয়ে দেখি—পাপান যত দ্রুত সম্ভব লিখে খাতায় তুলছে। আমাকে থামতে দেখে প্রশ্ন করল এইরকম কোন বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার খোঁজ কি পাওয়া গেছে? উত্তরে বললাম—গত বছর মার্চ 2018 পর্যন্ত যে বৃহত্তর মৌলিক সংখ্যাটি পাওয়া গেছে সেটি হল ($2^{82,\ 589,\ 933} - 1$ বা 24,862,048 অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা। গ্রেট ইন্টারনেট মার্সেনি প্রাইম সার্চ বা GIMPS নামে একটি সংখ্যা সর্বদা বৃহত্তর মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ে ব্যস্ত। এত বড় সংখ্যার কথা শুনে পাপান কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল—স্যার, মৌলিক সংখ্যা চেনার সহজ উপায় কি?

এর উত্তরে বললাম—দেখো পাপান, কোন একটি বিশেষ সংখ্যা মৌলিক কিনা তা জানতে কয়েকটি বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি। যেমন প্রথমত, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 ..... ধারা বিভাজ্যতার নিয়ম। আর দ্বিতীয়ত, এক থেকে 50 পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ একদম মুখস্থ রাখা। এর আবার দুটি সুবিধা আছে। এক হল—মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ে বড় ভূমিকা পালন করা আর দুই হল—পূর্ণবর্গ রাশির বর্গমূল খুব সহজেই নির্ণয় করা।

পাপান হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন কোন বিশেষ সংখ্যা মৌলিক কিনা নির্ণয় করতে গেলে শেষ পর্যন্ত কত দিয়ে ভাগ করলে তবে জানা যাবে? বুঝলাম পাপান সরাসরি প্রয়োগ দেখতে চায়। বললাম—দেখো 97, 429, 431, 991 সংখ্যাগুলি মৌলিক কিনা তা কিভাবে নির্ণয় করব? এবার তা দেখাব। 97 এর পরবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা হল 100 এর বর্গমূল হল 10। অর্থাৎ দশ পর্যন্ত সকল মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যদি বিভাজ্য না হয় তবেই সংখ্যাটি মৌলিক। দশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা হল 2, 3, 5, 7 মোট চারটি। এই চারটি দ্বারা 97-কে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় বলেই মৌলিক। আরও একটা উদাহরণ দিই। যেমন 991। সংখ্যাটি একক অবস্থানে আছে এক। তাই এক (1) এবং 9 এর বর্গেই একশ-র অবস্থানে আসে এক (1) আবার 991 এর নিকটবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা 1024। এবং যার বর্গমূল হল 32। তাই 32 সংখ্যাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি মৌলিক সংখ্যা দিয়ে দেখতে হবে নিঃশেষে বিভাজ্য কিনা? 32 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলি হল 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ..... বিভাজ্যতার সূত্রানুযায়ী 2, 3, 5, 7, 11 দ্বারা 991 বিভাজ্য নয়। বাকিগুলি দ্বারা ভাগ করলেও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না। অতএব 991 একটি মৌলিক সংখ্যা। এইভাবে মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় বেশ সহজেই করা যায়। পাপান শোনার শেষে বলল—এমন কোন সহজ চার্ট বার করা যায় না যে এক থেকে একশ পর্যন্ত সংখ্যার ভিতর মৌলিক সংখ্যা খুব সহজেই চেনা বা বেছে নেওয়া যায়। এই কথার উত্তরে বললাম—একটা চার্ট সহজেই করা যায়। যেমন ধরো দশ বাই দশ (10×10) এর একটা ম্যাট্রিক্স লিখে ফেললাম। এই ছবিটাকে একবার দেখ।

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50
51	52	**53**	54	55	56	57	58	**59**	60
61	62	63	64	65	66	**67**	68	68	70
71	72	**73**	74	75	76	77	78	**79**	80
81	82	**83**	84	85	86	87	88	**89**	90
91	92	93	94	95	96	**97**	98	99	100

চার্টটা দেখে পাপান জিজ্ঞাসা করল—এই চার্ট থেকে বিশেষ কি বোঝা যাবে? বললাম—একটু মন দিয়ে লক্ষ কর। তাহলেই বুঝতে পারবে। যেমন ধর দ্বিতীয় স্তম্ভে (ii)-তে সকল সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক 2 হয় যুগ্ম। ফলে এই স্তম্ভের কেউই মৌলিক নয়। ঠিক তেমনই চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম স্তম্ভে কোন মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের একক স্থানীয় অঙ্ক যুগ্ম হওয়ায়। তাহলে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম স্তম্ভের সকল সংখ্যা মৌলিক নয়বলে বাতিল হল। অবশিষ্ট থাকল স্তম্ভ এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয়ের কিছু সংখ্যা। পঞ্চম (V) স্তম্ভে 5 বাদ দিলে আর কোন সংখ্যাই মৌলিক নয়। ফল ঐ স্তম্ভও প্রায় বাতিল হয়ে যায়। চার্টটা দেখে পাপান খুব খুশি হয়ে বলল—হ্যাঁ স্যার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ঘরে মৌলিক সংখ্যার উপস্থিতি 4422322321। এই সংখ্যাকে মেনে চলে।

এরপর পাপান বলে উঠল—কি এলিমেন্টারি পার্টিক্যালের কথা বলছিলেন না প্রথমে। সেটা সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত বলেন।

এই কথার উত্তরে বললাম—দেখো পাপান রসায়নে বস্তুর গঠনতত্ত্ব আর গণিত সংখ্যার গঠনতত্ত্ব প্রায় এক। একাধিক মৌলের নির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্তির ফসল হল যৌগিক পদার্থ। যেমন

$$2H_2+O_2 = 2H_2O \quad ...(1)$$
$$4H_2+2O_2 = 4H_2O \quad ...(2)$$
$$6H_2+3O_2 = 6H_2O \quad ...(3)$$

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মত দুটি হাইড্রোজেন (মৌল) অনু ও একটি অক্সিজেনের (মৌল) সমন্বয়ে 2 অনু জল (যৌগ) গঠন করে। বা (1) নং সমীকরণ, যার চিহ্নিত। (2) ও (3) নং সমীকরণ হল একটি ঘটনার গুণিতক হারে জলের উৎপাদন বৃদ্ধি। অংশগ্রহণকারী মৌল হল গুননীয়ক। আর উৎপাদিত যৌগ হল গুণিতক। আবার গণিতের ক্ষেত্রে,

$$2^1 \times 3^1 = 6 = 1 \times 6$$
$$2^2 \times 3 = 12 = 2 \times 6$$
$$2^1 \times 3^2 = 18 = 3 \times 6$$
$$2^2 \times 3^2 = 36 = 6 \times 6 \; .....$$

এইভাবে 2 এবং 3 এই দুটি মৌল (মৌলিক সংখ্যা) 1:1 অনুপাতে 6 যৌগ (যৌগিক পদার্থ) নির্মিত হয়। আবার 6 যৌগটির (যৌগিক সংখ্যা) গুণিতক পেতে গেলে 2 এবং 3 এর ঘাত কিভাবে পরিবর্তন করলে পাওয়া যাবে—তা পরপর উদাহরণ সহ লিপিবদ্ধ করা হল।

তাই যৌগিক পদার্থ যেমন একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। ঠিক তেমনই যৌগিক সংখ্যা একাধিক মৌলিক সংখ্যা নির্দিষ্ট অনুপাতে (গুণিতকে) সৃষ্ট। ফলে রসায়ন ও গণিত বিচ্ছিন্ন নয়। লেখার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হলে সব বিষয়গুলিই একই হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর 2 ও 5 এই মৌলিক সংখ্যা (মৌল)-দ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক সংখ্যা (যৌগ)-গুলো লক্ষ করা যাক।

$$2^1 \times 5^1 = 10$$
$$2^2 \times 5 = 20$$
$$2^3 \times 5 = 40$$
$$2 \times 4^{\times 5} = 80 \; .....$$

এই 10, 20, 30, 80 ... এরা আবার গুণোত্তর প্রগতিভুক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। যার সাধারণ অনুপাত = 2. এদের গ.সা.গু. = 10. 2 গুণনীয়ক থাকায় প্রাত্যেকেই যুগ্ম। 10 হল মূল যৌগিক সংখ্যা (যৌগ)। বাকিগুলো অর্থাৎ 20, 40, 80, ... হল ঐ নির্দিষ্ট যৌগের নির্দিষ্ট গুণিতক।

আবার,
$$2 \times 5 = 10$$
$$2 \times 5^2 = 50$$
$$2 \times 5^3 = 250$$
$$2 \times 5^4 = 1250 \; .....$$

এখানেও 10, 50, 250, 1250 ..... একটি গুণাঙ্ক প্রগতিতে অগ্রসর হয়। যার গ.সা.গু. = 10. এই 10 হল মূল যৌগিক সংখ্যা (যৌগ)। বাকিগুলি 50, 250, 1250 ..... হল ঐ মূল যৌগের গুণিতক হারে উৎপাদন।

ঠিক একইভাবে অন্যান্য মৌলিক সংখ্যা (মৌল) নিয়ে তাদের সমন্বয়ে অজস্র যৌগিক সংখ্যা (যৌগ) খুব সহজেই নির্মাণ করা যায়।

যে মৌলিক সংখ্যাগুলি যৌগিক সংখ্যা নির্মাণে অংশগ্রহণ করে তাদের গুণনীয়ক বা উৎপাদক বলে। আবার ঐ উৎপাদিত যৌগিক সংখ্যা (যৌগ)-টি হল গুণিতক।

সব শুনে পাপান বলে উঠল—বুঝতে পেরেছি। বললাম—কোন মৌলিক সংখ্যা খুঁজতে গিয়ে পাশাপাশি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, মৌলিক চিন্তন আর মানুষের চুল, নখ ও অস্তিত্বের মৌলিকত্বের কথাও কিন্তু মাথায় রেখো। তবেই ধারণা স্পষ্ট হবে।

email:monotoshkumar.mitra@gmail.com • M. 9734695094

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

গা বেয়ে

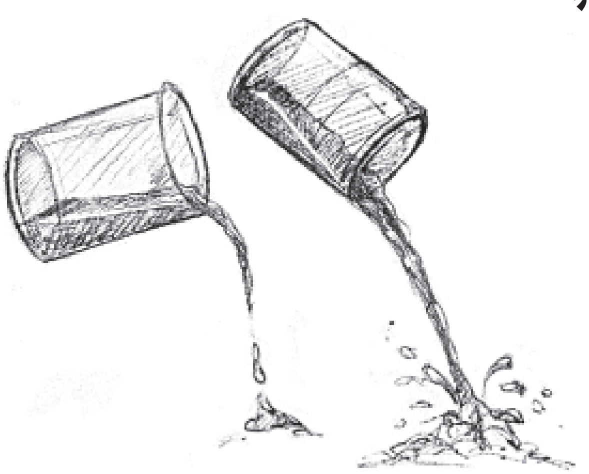

কোনও পাত্র থেকে আস্তে আস্তে দুধ বা ফলের রস ঢালতে গেলে পাত্রের কানা থেকে সোজা নীচে না পড়ে তরল পাত্রের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসে। অথচ তাড়াতাড়ি ঢাললে তরল কিন্তু সোজা নীচে পড়ে। কেন এরকম হয় ভেবে দেখেছ কখনও?

এটা আসলে বার্নৌলির নীতির প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্নৌলির নীতি সমস্ত প্রবাহীর (তরল বা গ্যাস) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই নীতিকে বলা হচ্ছে: কোনও অসংনম্য প্রবাহী যখন বয়ে যায়, তখন বেগ বাড়লে তার চাপ কমে যায় আর বেগ কমলে চাপ বেড়ে যায়। পাতলা কানাওয়ালা পাত্র থেকে যখন তরল ঢালা হয় তখন পড়ন্ত তরলধারার নীচের দিকের পাত্রসংলগ্ন স্তর ওপরের স্তরের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি নেমে আসে।

ফলে বার্নৌলির নীতি অনুযায়ী ঐ ধারার উপরের স্তরের চাপ বেশি আর নীচের স্তরের চাপ কম হয়। তাই বায়ুমন্ডলীয় চাপ ঐ ধারাকে পাত্রের গায়ে চেপে ধরে।

খুব তাড়াতাড়ি তরল ঢাললে পুরো তরল ধারা প্রায় একই বেগে পড়ে। তাই চাপের খুব বেশি পার্থক্য হয় না। ফলে তরল আর পাত্রের গায়ে লেগে থাকে না।

গা বেয়ে পড়া আটকাতে কোল্ড ড্রিংক্স-এর বোতলের মুখে সাধারণত মোটা করে একটা বেড় দেওয়া থাকে। যাতে তরল পড়বার সময় উপরের স্তর আর নীচের স্তর প্রায় একই পরিমানে বাঁক খায়। ফলে ঐ দুই স্তরে চাপের পার্থক্য অনেক কমে আসে আর তরল ঢালা অনেক সহজ হয়।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

জলদেবতার আবির্ভাব

ঝাড়খন্ডের চন্দন কেয়ারির একটি শুকনো মাঠে হঠাৎ ঝর্ণার মত জল বেরুতে দেখা গেল। আর তারপর আশপাশের মানুষ ব্যাপারটিকে অলৌকিক ঐশ্বরিক ব্যাপার বলে ধরে নিলেন। শুরু হল পূজা আচ্চা, ফুল দিয়ে, পয়সা ছুঁড়ে, ধূপ জ্বালিয়ে 'জলদেবতাকে' সন্তুষ্ট করার কাজ। এক পুরোহিতকে দেখা গেল পুজো করতে। অনেকে ঐ জল বোতল বা বাসনকোসনে ভরে ভক্তিভরে নিয়ে গেল ঐশ্বরিক প্রসাদ হিসেবে। ঘটনাটি ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের। (সূত্র : দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৯.৪.১৭)

আমাদের এই যজ্ঞভক্তির দেশে এমনই সব 'অলৌকিক' স্থানের ব্যাপার স্যাপার এখনো বেশ ভালই ঘটে চলেছে। কখনো পুকুরের জল বা কাদা, কখনো বা কোন একটা গাছে হনুমানের মুখের আদল পেয়ে বজরঙ্গবলীর পুজো, আবার কখনো হঠাৎ হঠাৎ ঘটা ঐ শুকনো মাঠে জল বেরোনের মত ঘটনা।

অথচ মানুষের মনে যদি এই দৃঢ় ধারণা থাকত যে জীবনে বা প্রকৃতিতে যাই ঘটুক না কেন তার পেছনে রয়েছে বাস্তব কিছু কারণ। ঐ কারণটি আপাতত জানা না গেলেও খোলা মনে অনুসন্ধান করলে ঠিকই তা জানা সম্ভব। তাই অহেতুক ব্যাপারটিকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ধরে নিয়ে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করা নিছকই মূর্খামি। কিন্তু আমাদের মত দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে উলটো বিশ্বাসের প্রাধান্যই প্রবল—নানা দেবদেবী, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা, গুরুজি-বাবাজিদের অলৌকিক ক্ষমতার দাবি ও ঐ অনুযায়ী প্রচার এসবের উপর আস্থা আর বিশ্বাসই খুব জোরদার। তাই কোথাও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেই তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অলৌকিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরে নিয়ে অসহায়ের মত চলে নিজেদের দুঃখতাপিত, সমস্যাসঙ্কুল জীবনে কিছু সুরাহা পেতে।

কিন্তু একটু খোলামনে যদি ঐভাবে হঠাৎ জল বেরনোর পেছনের কারণ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে তার সঠিক কারণটি জানা সম্ভব হতে পারে। যেমন হয়ত ঐ মাঠের তলা দিয়ে কোন জলের পাইপ গেছে। কোনভাবে তা ফুটো হয়ে তার থেকে জল বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া ঝাড়খন্ডের ঐ এলাকার আশেপাশে ছোটবড় পাহাড় রয়েছে। ঐ পাহাড় বেয়ে আসা জল মাটির তলায় গিয়ে একটি স্তরে পৌঁছনোর পর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে তা উপরে বেরুচ্ছে—এমনও হতে পারে। কারণ নীচের স্তরের জল পাহাড়ের উপরের স্তরের জলের একই তলে আসার চেষ্টা করে।

যাই হোক না কেন, ব্যাপারটিকে শুরুতেই অলৌকিক ঐশ্বরিক ভেবে নিলে ঐভাবে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের চেষ্টা আর উৎসাহই নষ্ট হয়ে যায়, যা ঘটে দৈনন্দিন জীবনের অন্য অনেক ক্ষেত্রেও।

অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের অলৌকিক হুজুগ কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়, যেমন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে চন্দন কেয়ারির ঐ 'অলৌকিক' ঝর্ণাও কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক সময় কিছু ধান্দাবাজ ধর্ম ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থে এইসব জায়গায় মন্দির জাতীয় কিছু বানিয়ে ব্যবসা করতে থাকে আর ব্যাপারটিকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে।

email:sahoo2331953@gmail.com • M. 9733400443

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

জয়দেব দে

চিনি, গুড় না মধু?

কথায় আছে যত গুড় ঢালবে, ততই মিষ্টি বাড়বে। বিভিন্ন খাবারে (যেমন দই, চা বা যেকোন দুগ্ধজাত খাবার, কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট বিভিন্ন ফাস্টফুড) মিষ্টি আনার জন্য চিনি বা গুড় মেশানো হয়। কখনও আবার মধু মিশিয়ে মিষ্টি বাড়ানো হয়।

অনেক মিষ্টি ফল যেমন, আপেল, আঙুর, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, চেরি, স্ট্রবেরি, বাতাবিলেবু, কাঁঠাল, আম ইত্যাদিতে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ নামে দুটি মিষ্টি উপাদান থাকে। আবার ফুল থেকে মৌমাছিরা যে মধু সংগ্রহ করে তাতে গ্লুকোজের চেয়ে ফ্রুক্টোজ বেশি থাকে। তাই মধু বেশি মিষ্টি।

চিনি, গুড় ও মধুর উপাদান		
চিনি	গুড়	মধু
(প্রতি ১০০ গ্রাম শক্তির জোগান ৩৯৪ ক্যালরি)	(প্রতি ১০০ গ্রাম শক্তির জোগান ৩৮৩ ক্যালরি)	(প্রতি ১০০ গ্রাম শক্তির জোগান ৩১৯ ক্যালরি)
শর্করা ঃ ৯৮ গ্রাম ক্যালসিয়াম ঃ ২৮ মিগ্রা ফসফরাস ঃ ৪ মিগ্রা (প্রোটিন ঃ ১০ মিগ্রা)	শর্করা ঃ ৭৫ গ্রাম (সুক্রোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ) জল ঃ ২২ গ্রাম ফ্যাট ঃ ০.১ গ্রাম প্রোটিন ঃ ০ গ্রাম ভিটামিন ঃ— ভিটামিন এ (Retinol) ঃ ২৮০ (আই ইউ) ভিটামিন বি$_1$ (Thiamin) ঃ ০.০৪১ মিগ্রা ভিটামিন বি$_2$ (Riboflovin)) ঃ ০.০০২ মিগ্রা ভিটামিন বি$_3$ (Niacin) ঃ ০.৯৩ মিগ্রা ভিটামিন বি$_5$ (Pantothenic Acid) ঃ ৮০৪ মিগ্রা ভিটামিন বি$_6$ (Pyridoxin) ঃ ০.৬৭ মিগ্রা কোলিন ঃ ০.১৩ মিগ্রা খনিজ লবণ ঃ— ক্যালসিয়াম ঃ ২০৫ মিগ্রা লোহা ঃ ১১.৪ মিগ্রা ম্যাগনেসিয়াম ঃ ২৪২ মিগ্রা ম্যাঙ্গানিজ ঃ ১.৫৩ মিগ্রা ফসফরাস ঃ ৮০ মিগ্রা পটাসিয়াম ঃ ৪৬৪ মিগ্রা সোডিয়াম ঃ ৩৭ মিগ্রা জিঙ্ক/দস্তা ঃ ০.২৫ মিগ্রা	শর্করা ঃ ৮২ গ্রাম (সুক্রোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, মলটোজ) জল ঃ ১৭ গ্রাম খনিজ লবণ ঃ— ক্যালসিয়াম ঃ ৬ মিগ্রা লোহা ঃ ০.৪২ মিগ্রা ম্যাগনেসিয়াম ঃ ২ মিগ্রা ফসফরাস ঃ ৪ মিগ্রা পটাশিয়াম ঃ ৫২ মিগ্রা সোডিয়াম ঃ ৪ মিগ্রা দস্তা ঃ ০.২২ মিগ্রা ভিটামিন ঃ— রিবোফ্ল্যাবিন (B_2) ঃ ০.৩৮ মিগ্রা নিয়াসিন (B_3) ঃ ০.১২১ মিগ্রা প্যান্টোথ্যানিক অ্যাসিড (B_5) ঃ ০.০৬৮ মিগ্রা পাইরিডক্সিন (B_6) ঃ ০.০২৪ মিগ্রা ভিটামিন (B_9) ঃ ২ মিগ্রা (Folic Acid) ভিটামিন সি ঃ ০.৫ মিগ্রা (Ascorbic Acid) ফ্যাট ঃ ০ মিগ্রা প্রোটিন ঃ ০.৩ মিগ্রা pH ঃ ৩.৯ মিগ্রা

আখের রস বা বীট থেকে চিনি তৈরি হয়। আবার আখের রস বা খেজুর রস জ্বাল দিয়ে ব্যবসায়িক ভাবে বিভিন্ন ধরনের গুড় তৈরি হয়। তাল বা তালের রস থেকে তালগুড় তৈরি হয়।

যাইহোক, এখন প্রশ্ন হল চিনি, গুড় না মধু? আমরা পুষ্টির বিচারে কোনটিকে কিভাবে প্রথম স্থান দেবো?

প্রথমেই আমরা চিনি, গুড় ও মধুর উপাদানগুলি জেনে নিই।

চিনি ঃ ১০০ গ্রাম চিনি থেকে ৩৯৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। গুড় বা মধুর চেয়ে বেশি। এর পুষ্টিমূল্য অনেক কম কারণ এতে বেশির ভাগটাই শর্করা। বেশি পরিমাণ চিনি ও ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে অগ্ন্যাশয়ের কার্যকারিতা কমে যায়। ফলে ডায়াবেটিস বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

চিনির (শর্করা) রাসায়নিক গঠন

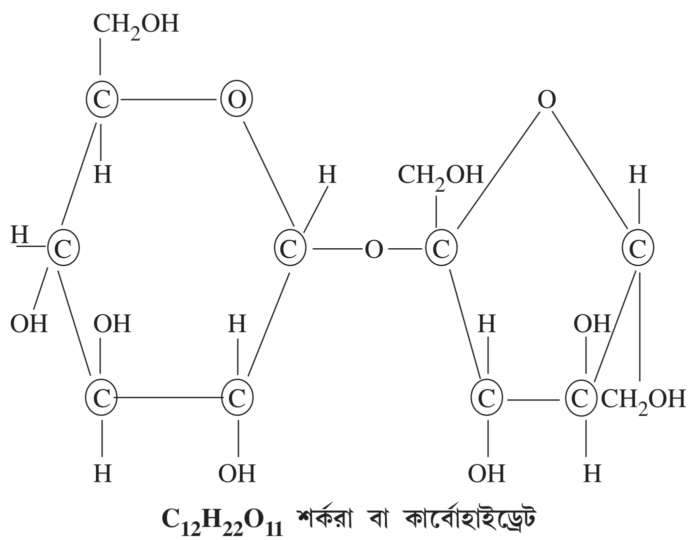

$C_{12}H_{22}O_{11}$ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

প্রাকৃতিক ভাবে আখ বা ইক্ষু (সুগার কেন) বা সুগার বিটে (যে বিট থেকে চিনি পাওয়া যায়) খুব সামান্য পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু পরিশোধিত চিনিতে এগুলি পাওয়া যায় না।

মধু ঃ ডায়াবেটিস রোগীদের পরিশোধিত চিনির চেয়ে মধু সামান্য বেশি উপকারি, তবে সামান্য পরিমাণে খেতে হবে। মধু জাতীয় সিরাপ-এর ক্ষেত্রে ভেজাল থাকার সম্ভাবনা থাকে। বেশ কিছু গবেষণায় জানা যায় মধু হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মধু উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কারণ এতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট (ফ্ল্যাভোনয়েড) থাকে। এছাড়া অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হার্টের স্বাভাবিক রক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না।

মধু আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল-এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস-এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

মধুতে বেশকিছু ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। খুব অল্প পরিমাণে নিয়মিত মধু খাওয়ার ফলে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যেহেতু প্রাকৃতিক ভাবে মধু সংগ্রহ করা হয়, ফলে মধুর বিভিন্ন ভিটামিন (বি, বি$_{২}$, বি$_{৩}$, বি$_{৫}$, বি$_{৬}$, বি$_{৯}$ ভিটামিন সি) গুলির গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার মধুতে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল দেওয়ার সুযোগ থাকে। খাটি মধুতে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ প্রায় সমান সমান থাকে।

চামড়ার ক্ষতস্থানে বা চামড়া পুড়ে গেলে মধু লাগানো যেতে পারে। গবেষকরা জানাচ্ছেন ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে পায়ের পাতায় ঘা বা ক্ষত নিরাময়ের জন্য (Diabetic foot ulcer) মধু লাগানো যেতে পারে।

শিশু এবং অন্যান্যদের কাশি কমানোর জন্য কাশির ওষুধ (Cough Medicine) বা Cough Syrup-এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক মধু অনেক বেশি উপকারী।

গুড় ঃ ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের শরীরে লোহার ঘাটতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে মহিলাদের শরীর দুর্বল হতে পারে। গুড়ে লোহা বেশ ভালো পরিমাণে থাকে। পাউরুটিতে বা রুটিতে চিনি না মিশিয়ে গুড় মাখিয়ে খাওয়া প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা চা বা কফির সঙ্গে চিনির বদলে গুড়কেই বেশি পছন্দ করে।

শরীরের হাড় গঠনে গুড়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ থাকার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরের হাড়ের রোগ প্রতিরোধ করে, পাশাপাশি দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

যাইহোক চিনি, গুড় আর মধু এই তিনটিই আমাদের শক্তি জোগায়। চিনির ক্যালরি মূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও পুষ্টিমূল্য অনেক কম। গুড়ের পুষ্টিমূল্য বেশি আবার মধু আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি বেশকিছু শারীরিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

এবার, নিশ্চয়ই আপনারা সহজেই বেছে নিতে পারবেন—চিনি, গুড় না মধু।

email:deyjoydev1964@gmail.com • M. 9474330092

সংবাদ

গঙ্গার অবিরলতা ও নির্মলতার দাবিতে অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের নদী ব্যবহারের ধারণা ও পদ্ধতি বদলের দাবিতে, পাশাপাশি গঙ্গার উপর অবৈধ দখল, বাঁধ নির্মাণ ও গঙ্গা দূষণের বিরুদ্ধে এবং ছোট ও বড় নদীগুলি বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়ার দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ বারাকপুর ধোবিঘাট সংলগ্ন এলাকায় সারাদিন ব্যাপি এক অবস্থানের আয়োজন করা হয়।

এই অবস্থান কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পরিবেশ কর্মীরা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ কর্মীরা গঙ্গা, মহানন্দা, তিস্তা, তোর্ষা, অজয়, জলঙ্গী, দামোদর, যমুনা সহ বিভিন্ন নদীগুলির বিপর্যয়ের কথা তথ্যসহ উল্লেখ করেন। নদী গবেষক ও পরিবেশকর্মী অনুপ হালদার একটি তথ্য উল্লেখ করে জানান শুধু গঙ্গা নদীর অববাহিকায় রয়েছে ১ হাজারের বেশি বাঁধ ও ব্যারেজ। এর ফলে গঙ্গা সহ বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদীগুলি আজ বিলুপ্তির মুখে। এর ফলে আমাদের রাজ্যে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

পরিবেশকর্মী রূপক মুখার্জী বলেন উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর উপর বাঁধ দেবার ফলে তিস্তা আজ অবলুপ্তির পথে। শ্রীমুখার্জী মহানন্দা নদীর দূষণ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেন।

সারাদিনের অবস্থানে বারাকপুর কাব্যসঙ্গীত আকাদেমি ও বাচিক কুটির সংস্থা পরিবেশ নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বপ্নিল শিশু কিশোর নাট্যসংস্থা পরিবেশ নিয়ে একটি মনোজ্ঞ নাটক পরিবেশন করেন।

নদীর বিভিন্ন দিক নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পথচলতি মানুষ সারাদিনের এই অবস্থান কর্মসূচিতে আগ্রহের সাথে বক্তব্য শোনেন ও বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ের বই পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেন সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর ও নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষে কল্লোল রায় ও রূপালী চাকলাদার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

জ্যোতিষের শূন্য গর্ভতা ২

গৌ ত ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ইতিহাস

[জানু-ফেব্রু সংখ্যায় যা ছিল ঃ মহাবিশ্বের বিশালতা ঃ...ছায়াপথ, আমাদের ব্রহ্মান্ড আসলে সূর্যের মত কোটি কোটি তারার ধুলো। ঐ ধুলো একেকটা কণা, একেকটা সূর্য অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। এমন দশ হাজার কোটি তারা বা সূর্য আছে আমাদের ছায়াপথে। ছায়াপথের দুটি প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ।]

মানব সভ্যতা বিকাশের পথে মানুষের প্রকৃতিগত অনুসন্ধিৎসা খুব স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টি ফেরাল মাথার ওপর ভেসে থাকা আকাশের বিস্ময়ের দিকে। অনিবার্য ভাবে নজরে এল চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের নিয়মবদ্ধ আবর্তনের প্রভাব পৃথিবীর প্রকৃতিতেও। যেমন : নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জোয়ার ভাঁটা, সূর্যের নির্দিষ্ট অবস্থানের ভিত্তিতে বৃষ্টিপাত, ফি বছর বন্যায় সূর্য চন্দ্রের নির্দিষ্ট ভূমিকা। আকাশে মেঘের মত ছায়াপথ অর্থাৎ বর্ষা চলে গিয়ে শরৎকাল। কীটপতঙ্গ, পশুপাখির বিভিন্ন ঋতুতে আসা যাওয়া (যেমন বসন্তে কোকিলের ডাক)। ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার ছিল না, মাস ঋতু বছরের ধারণা ছিল না। এইভাবে পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপোটেমিয়া, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশর, চিন ও ভারতের সিন্ধু সভ্যতায় গড়ে উঠেছিল জ্যোতিষশাস্ত্র। তখন আলাদা ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্রই ছিল সব। টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়া শুধু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই তৈরি হল ঘড়ি, ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা, চাষাবাদ, দূরযাত্রা ইত্যাদির জন্য ঋতু পরিবর্তন বোঝা, সময় গণনা ইত্যাদির বাস্তব প্রয়োজনে। নীলনদের বন্যা সূর্যের অবস্থানের সাথে যুক্ত থাকায় মিশরে সৌর ক্যালেন্ডার তৈরি হল। একটি বৃত্তকে ৩৬০°তে ভাগ, দিনকে ২৪ ঘন্টায়, ঘন্টা ও মিনিটকে ৬০ ভাগে ভাগ ইত্যাদি সুমেরিয়তেই হয়েছিল। ৭৮৭ খ্রি:পূ: থেকে সমস্ত গ্রহের সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক একটি তালিকা সম্ভবত ব্যাবিলনীয়দের কীর্তি। প্রায় ৯০০ বছর পর মিশরীয় জ্যোতিষবিদ্ টলেমি এই তালিকা ব্যবহার করে গণিত সহযোগে পৃথিবীকেন্দ্রিক (পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য চন্দ্র গ্রহরা প্রদক্ষিণ রত) বিশ্বের গঠন পরিকল্পনা গড়ে তোলেন, যা ষোড়শ শতাব্দীতে কোপারনিকাস আসার আগে পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। এই জ্যোতিষবিদ্যার অনেক কিছু যেমন সঠিক ছিল, তেমনি অনেক ভ্রান্তিও

সৌর ক্যালেন্ডার

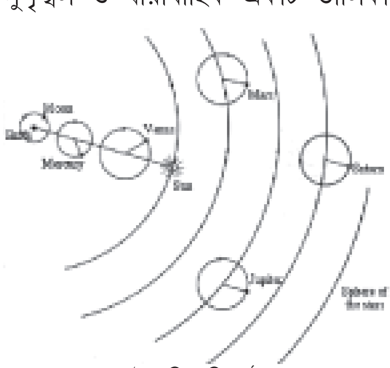

টলেমির বিশ্বগঠন

মিশে গিয়েছিল, যেমন ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষবিদ্যায় ৩৬০ দিনে বছর, ৩০ দিনে মাস, ৭ দিনে সপ্তাহের সঠিক হিসেবের সাথে মিশে গেছে ৭টি দিনের উপর ভ্রান্তভাবে ৭টি দেবতার প্রভাব। যেমন : শনি মড়কের দেবতা, রবি ন্যায়ের দেবতা, শুক্র প্রেমের দেবতা ইত্যাদি। ধারণা ছিল মানুষের চরিত্র ও জীবন এই দেবতা, পরমাত্মা বা পরমশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে শক্তি আবার এই মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ নক্ষত্রাদির অবস্থান হল দেবতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংকেত। আসলে ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত টেলিস্কোপ না থাকায় খালি চোখে নতুন কোনো আবিষ্কার আর সম্ভব ছিল না। আবার অন্যদিকে পাঁচ হাজার বছর আগের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ছিল রাজা ও পুরোহিত শাসিত। ফলে জ্যোতিষ ধর্মের সাথে জড়িয়ে যায়। ছিল ঈশ্বর কেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা। মানুষের নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নেই। সে ঈশ্বর চালিত অর্থাৎ নিয়তি বা অদৃষ্টবাদ। রাজা ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কাছে যা আকাঙ্ক্ষিত, তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে প্রসার ঘটতে থাকে অবৈজ্ঞানিক ভাগ্যগণনার, অপবিজ্ঞান আর কুসংস্কারের।

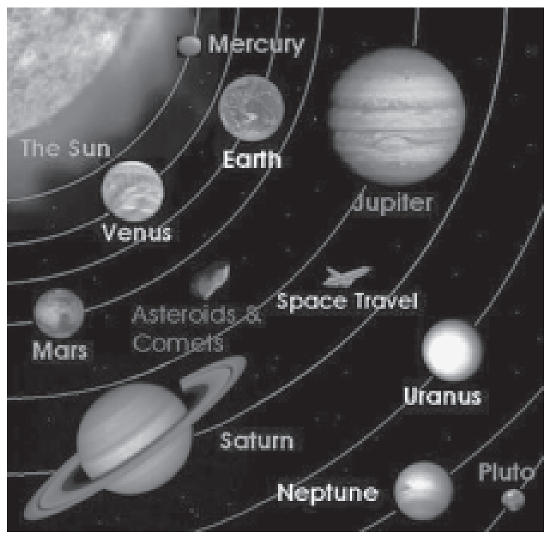

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নবজাগরণের সময় কোপারনিকাস টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে দিলেন। বললেন—সূর্যই সৌরমন্ডলের কেন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্যরা তার চারপাশে প্রদক্ষিণরত। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের সাহায্যে গ্যালিলিও এবং জিওর্দানো ব্রুনো কোপারনিকাসের পরিকল্পনাকে আরো বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হল। তখন রাজশক্তি ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিপন্ন বোধ করল। কারণ ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্যে রাজা ও পুরোহিতের ক্ষমতাও যে লুকিয়ে থাকে। মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পৃথিবীর হাত থেকে বাইরে চলে

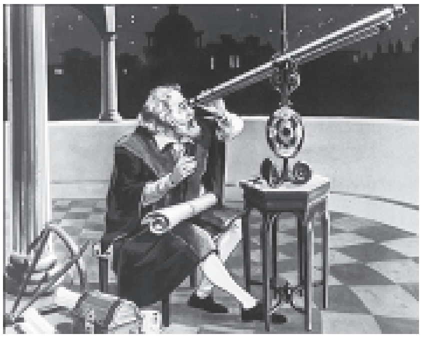

গ্যালিলিও

গেলে তাঁরাও যে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বেন। রাজশক্তি ও ধর্ম তাই নিজের স্বার্থে স্থিতাবস্থা ও প্রচলিত বিশ্বাসকেই নিজের অস্তিত্বের আশ্রয়স্থল মনে করল। কোপারনিকাস, গ্যালিলিওর শাস্তি হল। গ্যালিলিও জেলে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে গেলেন এ মহাবিশ্বকে দেখবার দৃষ্টি।

বৈদিক জ্যোতিষে কোথাও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের সাথে মানুষের ভাগ্যের সম্পর্ক ছিল না। এটি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থা। খ্রি:পূ: ৬০০ থেকে ২০০ সালে খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণ ও তাকে গাণিতিক ভাবে গেঁথে তৈরি হয়েছিল বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, যা বৈদিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক পঞ্জিকাবিশেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীকালে ভারতে ধর্ম ও জ্যোতিষ জোট বেঁধে থাকায় তার বিজ্ঞান ও দর্শন বিকশিত না হয়ে ব্যবসায়িক চাহিদায় টিকে থাকার লক্ষ্যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সীমারেখাতেই আবদ্ধ থেকে দেশময় প্রসারিত হতে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জ্যোতিষে যাত্রা এই সময় পুরোহিতদের দ্বারাই সংঘটিত হয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অসৎভাবে কাজে লাগিয়ে। তারাই গ্রহ নক্ষত্রকে মানুষের ভাগ্যের সাথে জুড়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলাদা হবার এই হল শুরুর কথা। আর তাই আজ মহাকাশ থেকে জানতে পারা যায় চাকরির সময়, পরীক্ষার রেজাল্ট, কোর্টকেসের ফল, শ্বশুরবাড়ির অশান্তি, চাকরিতে পদোন্নতি, বশীকরণ সম্ভব কিনা। দিনে দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত এত উন্নত হল যে প্রাচীন ভ্রান্তিগুলোকে আবর্জনার মত ফেলে দিল। আর সেই অপবিদ্যার আবর্জনাগুলোই রয়ে গেল জ্যোতিষশাস্ত্র হিসেবে। গণৎকারদের স্বার্থে তা আরও কুৎসিত, হাস্যকর হয়ে উঠল। যেমন শনির প্রভাবে কারো সাইকেল চুরি যায় কিংবা বৃহস্পতি সহায় না থাকায় বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য হয়।

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

email:gbandyo55@gmail.com • M. 9748127195

সংবাদ

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৭তম বর্ষ উদ্‌যাপন

১২ জানুয়ারি ২০২০ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাকক্ষে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৭তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে ডঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু, তপন সাহা, কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন বিশ্বাস, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তাপস মজুমদার, অর্চন সমাজদার, সুবিনয় পাল প্রমুখ উপস্থিত থাকেন।

প্রথম পর্যায়ে 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি কি কুসংস্কারের বিলুপ্তি?' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি কি পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি?' আলোচনায় প্রায় ২২ জন বিজ্ঞানকর্মী ও লেখকরা বক্তব্য রাখেন।

তাপস মজুমদার পত্রিকাটির বিষয় নিয়ে পাঠকদের কাছ থেকে সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করেন। প্রকাশক জয়দেব দে জানান, বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটি আগামীদিনে প্রচারসংখ্যা ও কলেবর বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করা হবে। পত্রিকাটির গুণমান যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সেদিকে সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন।

With Best Compliments :

This Space is donated by

A Well Wisher

রতন দেবনাথ

সোলার অরবিটার ঃ সূর্য নিরীক্ষণ

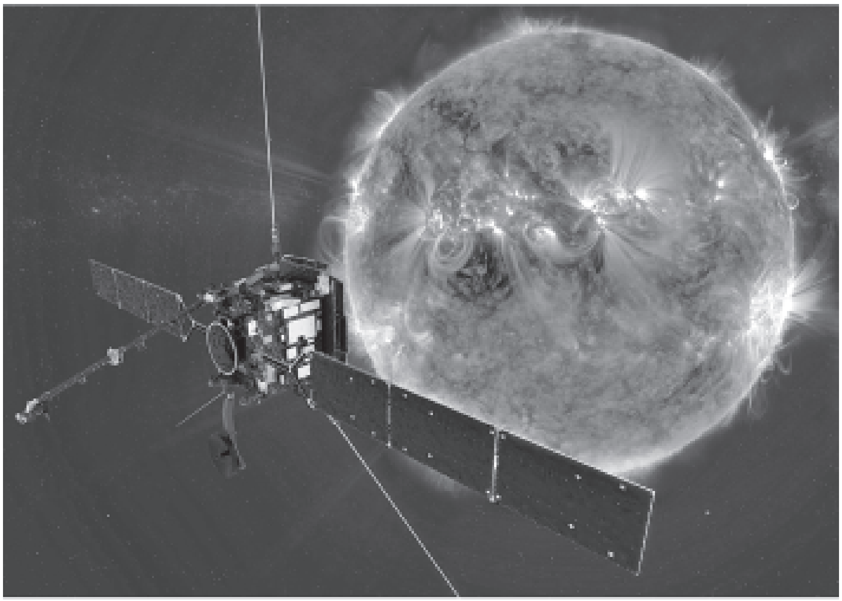

সোলার অরবিটার

সৌরজগতের প্রাণশক্তি সূর্য। সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলো ঘুরে চলেছে অনবরত। পেট ভরা হাইড্রোজেন জ্বালানি ক্ষয় করে সৃষ্টি করে চলেছে আলো আর তাপ যুগ যুগ ধরে। সেই আলো আর তাপে ধন্য আমাদের এই পৃথিবী। ঘটে চলেছে প্রাণের স্পন্দন।

সূর্য আসলে একটি বামন নক্ষত্র। আকারে ছোট এবং কম ঔজ্জ্বল্যের নক্ষত্রগুলিকে সাধারণত বামন নক্ষত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে সূর্যও একটি বামন নক্ষত্র। সৌরজগতের মাঝখানে থেকে অভিকর্ষের প্রচন্ড টানে সূর্য ধরে রেখেছে তার চারপাশের বড় বড় গ্রহসমেত উল্কাপিন্ডের মত ছোট ছোট টুকরোসমূহকে যার যার নিজ নিজ কক্ষপথে। সূর্যের ভিতরে আয়নিত প্লাজমার উথাল-পাথালে সৃষ্ট তড়িৎ তৈরি করে চৌম্বক ক্ষেত্র। আর সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা আয়নিত কণার স্রোত বয়ে নিয়ে চলে সেই চৌম্বক ক্ষেত্র সারা সৌরজগতময়। আয়নিত ওইসব কণার স্রোতকে বলে সোলার উইন্ড।

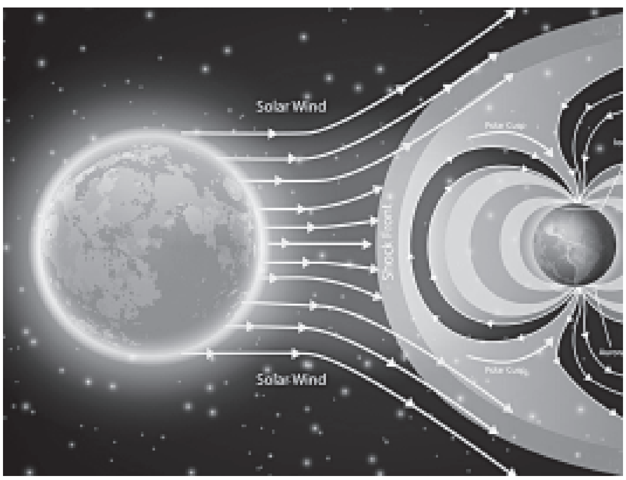

সোলার উইন্ড

সূর্যকে ঘিরে রয়েছে এক সুবিশাল আবরণ। যেন এক বিশাল বুদবুদের ভিতরে ঠাসা রয়েছে সারা সৌরজগত। আর এই আবরণ সৌরজগৎকে আলাদা করে রেখেছে আন্তর্নক্ষত্র জগৎ থেকে। ১৯৬৭ সালে হাউস্টনের রাইস ইউনিভার্সিটির স্পেস ফিজিক্স এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলেক্সান্ডার ডেস্লার প্রথম এই আবরণকে হেলিওস্ফিয়ার নামে চিহ্নিত করেন। সূর্য থেকে ক্রমাগত আসা সোলার উইন্ড বা আয়নিত কণা বাড়িয়ে তুলছে হেলোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি। সূর্য থেকে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিট বা প্রায় ১৮ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থেকে হেলিওস্ফিয়ার সৌরজগতের গ্রহগুলোকে রক্ষা করে চলেছে বাইরের থেকে আসা বিকিরণ থেকে। যেন বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে এক ঢালের মতো। সূর্য যেন তার পরিবারকে রক্ষা করতেই তৈরি করেছে এই ঢাল।

হেলিওস্ফিয়ার নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের শেষ নেই। সূর্য

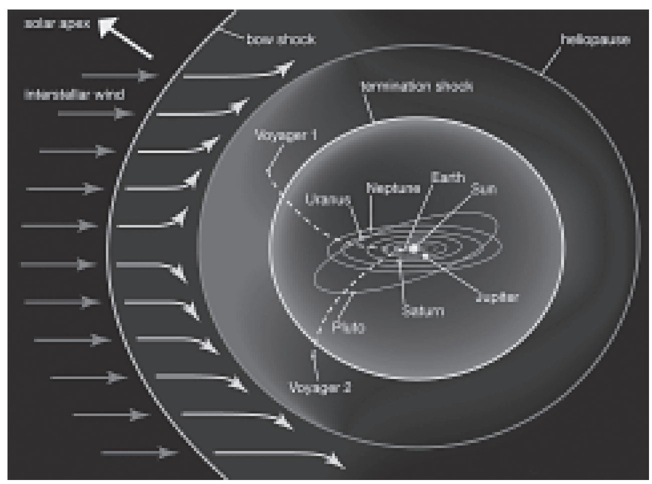

হেলিওস্ফিয়ার

কিভাবে সৃষ্টি করে হেলিওস্ফিয়ার? কিভাবেই বা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে? এসব নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে। আর সেই কৌতূহলের নিরসন করতেই তাঁরা এক মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করতে চলেছে সূর্যের উদ্দেশ্যে। 'সোলার অরবিটার' নামের এই মহাকাশযানটি সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ই এস এ) এবং ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) যৌথ উদ্যোগে ফ্লোরিডার কেপ কেনেভেরাল থেকে অ্যাটলাস ৫ রকেটে চেপে সোলার অরবিটার পাড়ি দেবে সূর্যের দিকে। হেলিওস্ফিয়ারের সুলুক সন্ধান ছাড়াও সূর্য থেকে

বেরিয়ে আসা আয়নিত কণা বা সোলার উইন্ডের তদ্বির করা এবং সূর্যের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের হাল-হকিকত জানাও হবে সোলার অরবিটারের কাজ।

পৃথিবী এবং শুক্র গ্রহের অভিকর্ষকে কাজে লাগিয়ে সোলার অরবিটারকে স্থাপন করা হবে এক উপবৃত্তাকার কক্ষে। সূর্য থেকে প্রায় ৪২ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে থেকে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে চক্কর কাটবে এটি। এরকম একটি কক্ষে থেকে সোলার অরবিটার পর্যবেক্ষণ করবে সূর্যের এমন কিছু অংশ বিশেষ করে সূর্যের মেরু অঞ্চল যা এর আগে কখনও পরখ করে দেখা হয়নি।

সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে এর আগে ১৯৯০ সালেও নাসা এবং

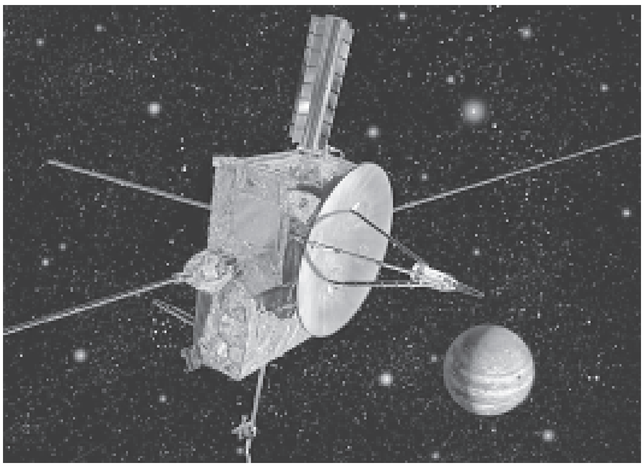

ইউলিসিস

ই এস এ-এর উদ্যোগে পাঠানো হয়েছিল এক মহাকাশযান। 'ইউলিসিস' নামের এই যানটির কার্যকাল শেষ হয় ২০০৯ সালে। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছিল তিনবার। তবে ইউলিসিস কখনই পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে যে দূরত্ব তার চেয়ে কম দূরত্বে সূর্যের কাছে আসতে পারেনি। তার পর্যবেক্ষণের পরিধিও ছিল সীমিত।

কেবলমাত্র মহাকাশযানটির আশপাশের পরিবেশের হদিসই নিতে পেরেছিল এর বেশি নয়। সোলার অরবিটার সে তুলনায় আরেকটু উন্নত। এটি চলে যাবে বুধের কক্ষপথ ছাড়িয়ে আরও ভেতরে সূর্যের কাছাকাছি। এছাড়া সোলার অরবিটারে থাকবে মোট দশটি যন্ত্রাংশ। এর মধ্যে চারটি করবে স্থানীয় পর্যবেক্ষণের কাজ আর বাকি ছয়টি দূর চিত্রগ্রাহক যন্ত্র যা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে অনেকটা দূর থেকেও। যন্ত্রাংশগুলো ছোট ছোট জানালার ভিতর দিয়ে দেখবে সূর্যকে। যন্ত্রাংশগুলোকে প্রায় ফুটখানেক চওড়া টাইটেনিয়াম চাদরে মুড়ে রক্ষা করা হবে তাপজনিত ক্ষতি এবং সূর্য থেকে আসা আয়নিত কণার হাত থেকে।

সূর্যের দুই মেরু অঞ্চলকে পাখির চোখ করা হয়েছে সোলার অরবিটারের। এর কারণও রয়েছে যথেষ্ট। মেরু অঞ্চলের কর্মকান্ডই হয়ত ব্যাখ্যা করতে পারে শতাব্দী প্রাচীন বিভিন্ন ঘটনার। সূর্যের আলোকমন্ডলে সাময়িকভাবে কখনও কখনও কোনও কোনও জায়গায় দেখা যায় কালো কালো দাগ। এগুলোকে বলে সৌরকলঙ্ক। এসব অঞ্চলে সৌর চৌম্বকক্ষেত্রের আধিক্যের কারনে তাপমাত্রা যায় কমে। ফলে এসব স্থান কালো দেখায়। ১৮৪৩ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ স্যামুয়েল হাইনরিখ সোয়াবে লক্ষ করেছিলেন এক অভিনব ঘটনা। তাঁর যেন মনে হয়েছিল সৌরকলঙ্কগুলো পর্যায়ক্রমে বাড়ছে এবং কমছে।

বর্তমানে এটা জানা গেছে যে, প্রায় ১১ বছর সময়ের অন্তরে সৌরকলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সৌরকলঙ্ক বাড়তে থাকার সময়কে বলে সোলার ম্যাক্সিমাম এবং কমতে থাকার সময়কে বলে সোলার মিনিমাম। সোলার ম্যাক্সিমাম কালে সূর্য থাকে সক্রিয় এবং অশান্ত। বাড়তে থাকে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা। আর সোলার মিনিমাম কালে সূর্য হয়ে যায় অনেকটাই শান্ত। সৌরকলঙ্কের সংখ্যাও কমে যায় অনেকটাই। ১১ বছরের এই চক্রে সৌরকলঙ্কের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি কেন হয়, কেনই বা কোন কোন সোলার ম্যাক্সিমাম অন্যদের থেকে বেশি শক্তিশালী এসব প্রশ্নে উত্তর এখনও অজানা। হয়ত বা সূর্যের মেরু অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্রই দিতে পারে তার উত্তর।

email:rdbnath1961@gmail.com • M. 9477934928

পরিবেশ ডট কম
পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পরিবেশ ডট কম

বাংলা ভাষায় পরিবেশ ও বিজ্ঞানের
একমাত্র চ্যানেল ও পোর্টাল

Mobile - 9051222813
Email - poribesnews@gmail.com
Website - www.poribes.com

কবিতা

জগন্ময় মজুমদার

প্যাসন ফ্লাওয়ার

কুঁড়ি থেকে ফুলের দূরত্ব কতটুকু হতে পারে
কেউ কী জেনেছে ঠিক অরণ্যবিহারে?

কত কষ্ট কত দাহ গর্ভাশয়ে অমরাবিন্যাসে
কতটুকু চিড় ধরে নিবিড় বিশ্বাসে
আমাকে বোঝাতে চায় উদ্ভিদবিজ্ঞানী
আমাদের প্রিয় তাহসিনা আপামণি
চোখদুটি চশমার গ্লাসে
কেটেকুটে ছিঁড়েছুঁড়ে প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ঃ
পাপড়ি বিন্যাসে দ্যাখো ক্রুশবিদ্ধ যিশু
এইটাই আজকের ইস্যু।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড কান্ডে ও মূলে
আছে মানুষেরা আজ অলিখিত শূলে
হাসিমুখে আপামণি বললেন ফের ঃ

নেপথ্যে ক্রুরতা আছে মায়া-সুন্দরের।

সুনীল শর্মাচার্য

প্রতিদিন

প্রতিদিন কত কীট-পতঙ্গ
জন্ম হয়, মরণ হয়
পুরাতন ধ্যান-ধারণাও
পাল্টে যায়—

বৃষ্টি-বাদলে
নেমে আসে কত রূপ-রঙ
প্রকৃতি সরব হয়

জ্ঞান-বিজ্ঞান জুড়ে
কত পর্যবেক্ষণ—
পরীক্ষা-নিরীক্ষা—
কোটি কোটি বছর ধরে
সূর্য-তারার জন্ম হয়...

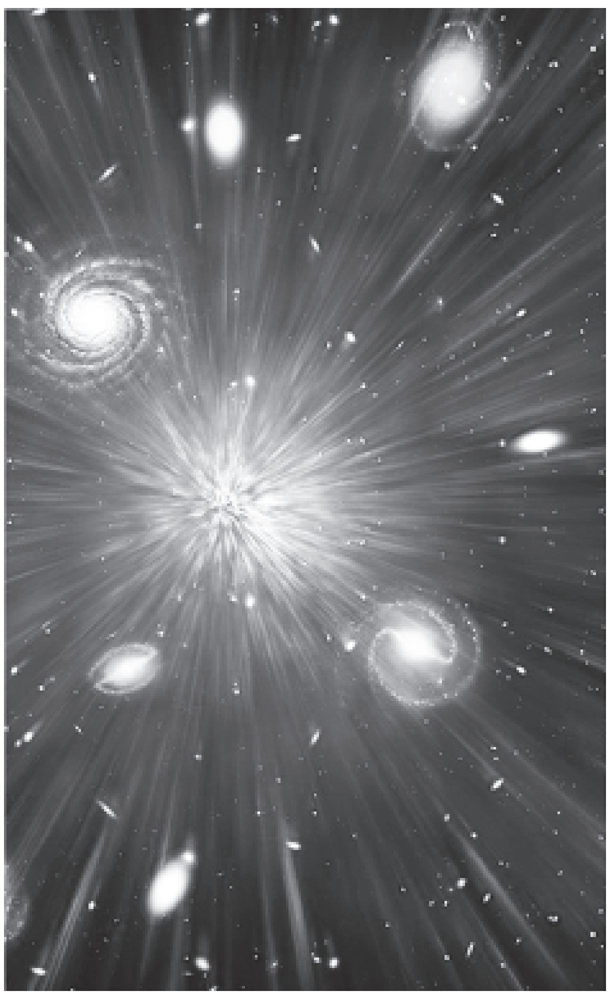

শিবপ্রসাদ পাল

সমর্পণ

সমুদ্রজল কখনও যায় না
উপচে পড়ে
মাধ্যাকর্ষণ

উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু
পরস্পরকে করে
আকর্ষণ

ছায়াপথে
অসংখ্য গ্রহ তারার
ঘূর্ণন

সূর্যমুখী সূর্যের দিকে
নিজেকে করে
সমর্পণ

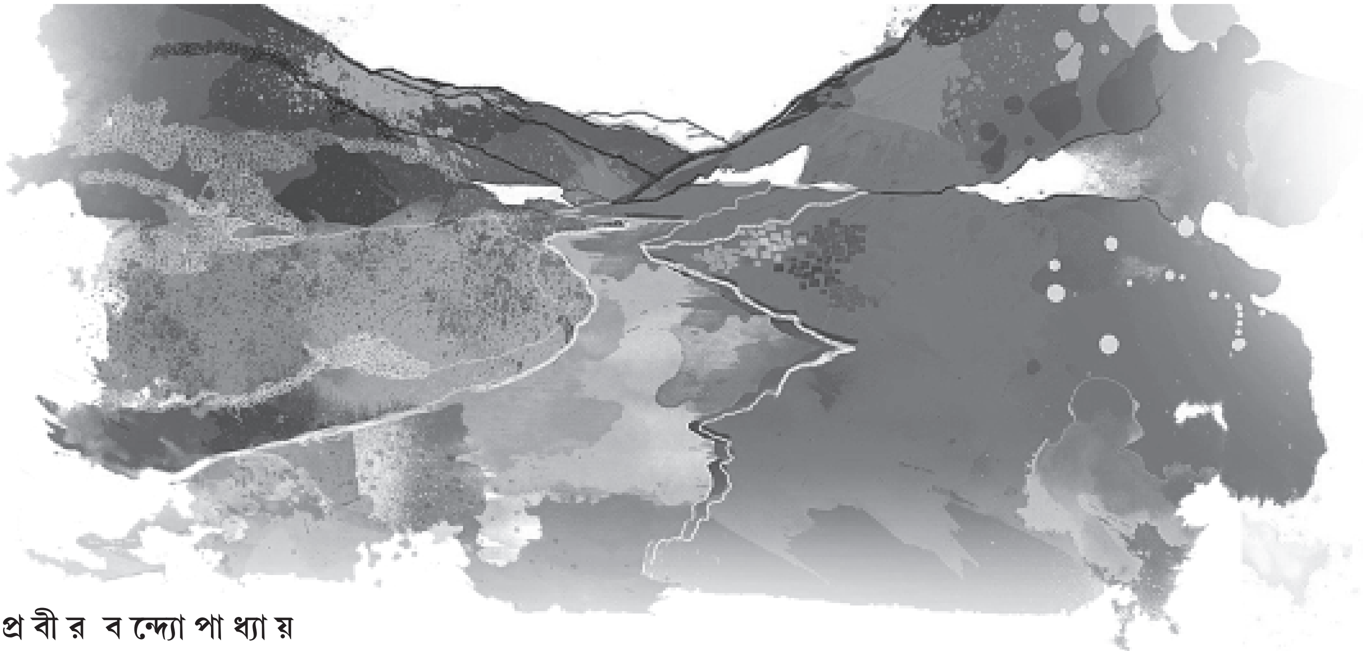

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মরণোত্তর

তাকে যখন খুঁজে পেলাম তখন মাঠভর্তি দুপুর
শীর্ণ সাঁকোর নিচে পড়ে আছে রুগ্ন শরীর
বিক্ষত দেহে শুধু প্রাণটুকু জাগে—
হয়তো বা তাও নেই আর!

আদিম কোনও অন্ধকার চষেছে তার পেট
কারা যেন রোগা বুকের আলোটুকু শুষে নিয়ে গেছে
শহুরে জঞ্জাল এসে মুখ ঢেকেছে তার—
কেবল তিরিতিরি জলের ধারা
মরা চোখে ভাসে ঃ

আমার বাল্যসখী সেই নদীকে আমি
মরণোত্তর প্রণাম জানালাম।

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

কৃতঘ্ন

অমোঘ শুশ্রূষাকারী নিম।
পাতা ছিঁড়ি
ডাল ভাঙি
ছাল তুলে চূর্ণ করে রাখি;
ডাল ছেঁটে বানাতে চায় মানুষেরা
নিজেদের মাপে।

গাছ তো!
প্রতিদিন ছড়িয়ে যায় তবু
প্রসারিত হিতকারী অগুণিত হাতে।

মানুষ যে!
যার কাছে যত বেশি মানুষের ঋণ
তাকে বিঁধতে তক্কে তক্কে থাকে নিশিদিন।

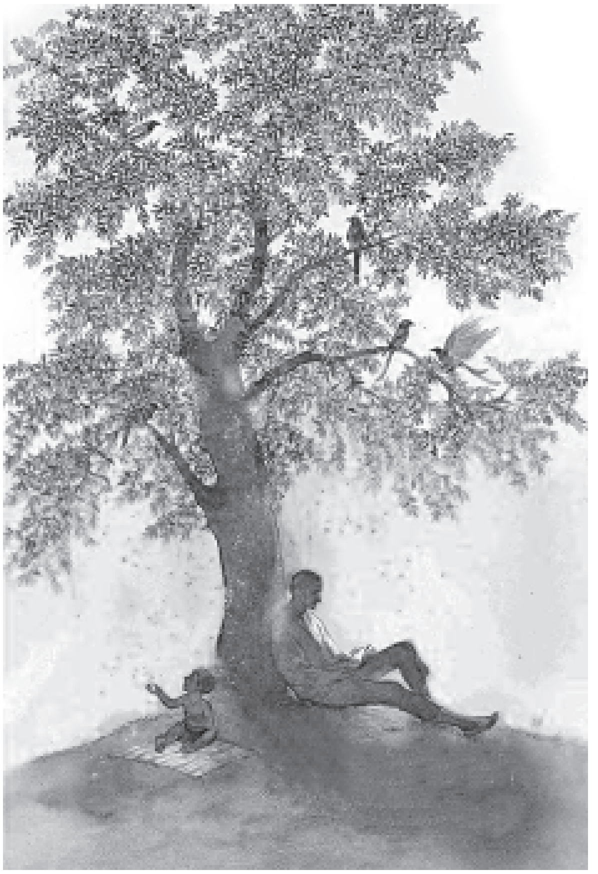

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

ছায়া

আর কোনো ছায়া নেই

আলোর বৃত্তে ঘুরে যায়
মরণপ্রিয় মানুষ

পাখি চায় ছায়া
উড়ে আসা হাজার মাইল
গাছ খোঁজে অরণ্যের ছায়া

ছায়ার ভিতরে ঘন
ছায়ার বৃত্তে ঘন
ছায়া চায় শরীর ও মন

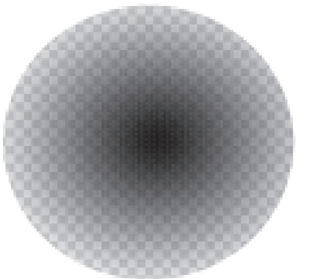

অ নু প হা ল দা র

আন্তঃসীমান্ত নদী ঃ ইছামতী ও মাথাভাঙ্গা

ইছামতীর নদীর উৎস মুখ

গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার বদ্বীপই হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং উর্বর বদ্বীপ। হিমালয়ের নুড়ি, পাথর উর্বর পলি হয়ে ফিরে এসে গঠন করেছে এই ভূভাগ। এই বদ্বীপের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হত নদী। আর এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সভ্যতা। সভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সাথে ভাগ হল ভূখন্ড। আসল কাঁটাতার, দেশভাগের সাথে সাথেই ভাগ হল মাটি, জল প্রভৃতি। যুগযুগান্ত ধরে প্রবাহমান নদীর মালিক হয়ে উঠল দুটি দেশই। দুটি দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রমকারী প্রবাহমান জলধারাগুলি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নদী। আর এই আন্তর্জাতিক নদীগুলির রক্ষার জন্য দুটি দেশেই তৈরি হল পৃথক নদীমন্ত্রক এবং আন্তর্জাতিক নদী কমিশন। কিন্তু বাস্তবে নদীর স্বার্থরক্ষা হল কতদূর? এই প্রবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমকারী নদীগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইছামতী : ভারত ও বাংলাদেশে ইছামতী নামের নদীর সংখ্যা গোটা দশেক। তবে বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের, নদীয়া জেলার মাঝদিয়াতে উৎপত্তি আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমকারী ইছামতী নদীর কথা আলোচনা করব। মাথাভাঙ্গা নদী পাবাখালিতে এসে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। ডানদিকের শাখাটি চুর্নি নামে ও বাঁদিকের শাখাটি ইছামতী নামে পরিচিত। দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে ইছামতী বর্তমানে নদী ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৮৬২/১৮৬৪ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গের সাথে রেল যোগাযোগ তৈরি হওয়ার সময় উৎসমুখে বড় বড় বোল্ডার, চুন, সুড়কি প্রভৃতি ফেলে বেগবতী ইছামতীর গতি রুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে তখনই মাথাভাঙ্গা নদীর থেকে প্রায় ৫/৭ ফুট উঁচু হয়ে যায় ইছামতীর উৎসমুখ। আজও ছবিটি একইরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে। ইছামতীর উৎসমুখে নৌকার বদলে এখন চলে মোটর চালিত যানবাহন। নদীটির মোট গতিপথ ২১০ কি.মি. (আনুমানিক) হলেও উৎসমুখ থেকে নদীটি ১৯.৫ কি.মি. ভারতে প্রবাহিত হবার পরই ফতেপুর থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের ভিতর আনুমানিক ৩৭ কি.মি. প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দত্তফুলিয়া দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের প্রবাহিত ৩৭ কি.মি. নদীটি কার্যত জলশূন্য। প্রায় বারো মাসই নদীবক্ষে ধানচাষ চলে। কোন কোন স্থানে নদীর রেখাটিও নেই। এরপর দত্তফুলিয়া, স্বরূপনগর, বনগাঁ, বসিরহাট হয়ে নদীটি হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রবাহিত। হাসনাবাদ থেকে নদীটি পুনরায় দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি কালিন্দী ও অপরটি ডাঁশা নদী নামে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগর ও রায়মঙ্গলে মিশেছে। ভারতের দিকে বনগাঁ মহকুমার ৮৪ কি.মি. নদীটি কচুরিপানায় আবদ্ধ তবে বসিরহাট মহকুমায় নদীটিতে জোয়ারভাঁটা খেলে এবং নদীটি বেশ প্রশস্ত।

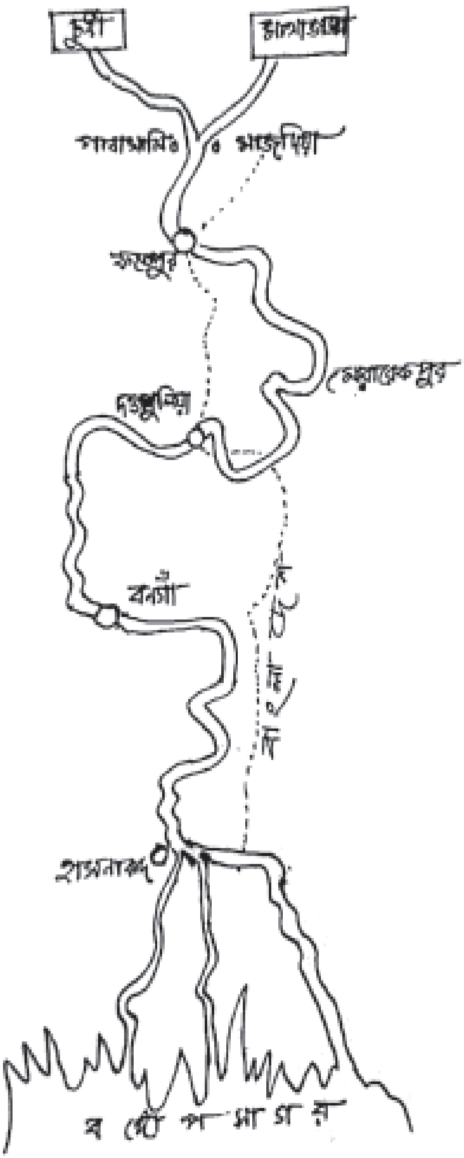

ইছামতীর নদী

মাথাভাঙ্গা ঃ এটি ভারত ও বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। উৎপত্তি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণ ইউনিয়নের প্রবাহমান পদ্মা থেকে। (বর্তমানে উৎসমুখ বিচ্ছিন্ন)। এর দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১২১ কি.মি., গড় প্রশস্ততা ২৯ মি., নদীটি পশ্চিমবঙ্গের গেদে সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। নদীটির অববাহিকা ১৫০০ বর্গ কি.মি.। নদীটিকে বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম দূষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত নদীর একটি বলে মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপারে (বাংলাদেশের দিকে) আনুমানিক ১০/১৫ কি.মি. দূরে এই নদীর পাড়ে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ কারখানা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি। (প্রায় সাড়ে তিন হাজার একর জমির উপর অবস্থিত কারখানাটি)। এটি মূলতঃ চিনি তৈরির কারখানা হলেও বর্তমানে দেশি ও বিদেশি মদ, স্পিরিট, রাসায়নিক সার ও প্রায় ৩৬ প্রকারের পণ্য উৎপাদিত হয়। তার বর্জ্যগুলি কোনরকম পরিশ্রুত না করেই নদীতে ফেলা হয় দিনের পর দিন। এবং ওই জল সীমান্ত পেরিয়ে সহজেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং মাথাভাঙ্গার সাথে সাথে চুর্নি ও গঙ্গাতেও সেই ভয়ানক দূষিত জল মিশছে। এই দূষণের মাত্রা এতটাই প্রবল যে ১০০টিরও বেশি নদীতীরবর্তী গ্রামের মানুষ তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন বাধ্য হয়ে। নদীতীরবর্তী ২-২.৫ কি.মি. দূর থেকেও বিষাক্ত জলের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বিষাক্ত ওই লাল বর্ণের জলের প্রভাবে নদীর সাপ, ব্যাঙ, মাছ, পোকামাকড় প্রভৃতি মরে ভাসতে থাকে। তা থেকেও ছড়াতে থাকে দূষণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টের সাম্প্রতিক গবেষণায় যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তা হল, নদীতীরবর্তী অঞ্চলের পানীয় জলে আর্সেনিক ছাড়াও নাইট্রেট পাওয়া গেছে এবং বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আরও অন্য ধাতু বা রাসায়নিক মিশে থাকতে পারে ওই জলে। এবং তা উদ্ভিদ, প্রাণী, ফল, ডিম, এমনকি দুধের মাধ্যমে আমাদের ভূগর্ভস্থ খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক অশনিসংকেত বহন করছে। এছাড়াও নদীর মাঝামাঝি বাঁধাল (বস্তা, নেট ও বাঁশের পাটাতন আড়াআড়ি নদীতে দিয়ে নদীর জলের প্রবাহকে বন্ধ করে দেওয়া) দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দিকেই নদীর গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস বহুদিনের। ভারতের দিকে এই বাঁধালের সংখ্যা গোটা পাঁচেক হলেও বাংলাদেশের দিকে পাঁচশর অধিক। এছাড়াও ওপার বাংলায় চুয়াডাঙা, দর্শনা অঞ্চলে পৌরবর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হয় এই নদীতে। এই নদীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জলনীতির সবকটি চুক্তিই লঙ্ঘন করেছে বাংলাদেশ। *email:anuphalderkly@gmail.com • M. 9143264159*

With Best Compliments : Mobile : 9332280603

স্টুডিও ইউনিক

জেরক্স ও ল্যামিনেশন করা হয়

কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া

যে কোন অনুষ্ঠানে উন্নত মানের স্টিল ও ভিডিও করা হয়

পরিবেশ ২

তপনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁধ নয়, কুয়োই আধুনিক ভারতের মন্দির

মনে করুন এই সকালে আপনি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার বাড়িতে; কলে জল আসেনি। আমরা অবশ্য অভ্যস্ত এটায়, তবে এবারের সমস্যা; কর্পোরেশন জানিয়ে দিয়েছে কলে আর জল আসবে না; আপনাকে রেশন কার্ড হাতে যেতে হবে কাছের জল বিতরণ কেন্দ্রে, আপনার বাড়ির সদস্য সংখ্যার মাপে জল পাবেন প্রতিদিন রেশন কার্ড দেখিয়ে।

এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে 'Day Zero' আমি অনুবাদ করলাম শেষের সেদিন। বিচ্ছিন্নভাবে জলের অভাবে আমরা অভ্যস্ত; তবে জলে মানুষ প্রতি প্রয়োজনের চেয়ে বিতরণ যখন ১৩.৫% তলায় চলে যায়, তাকেই বলে সেই নগরের শেষের সেদিন। আজকে এই অবস্থায় খুবব কাছে চলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহর।

কেপটাউনের জলের চাহিদা মেটায় কাছের একটা হ্রদ; গত বেশ কয়েক বছরের খরায় তার জল নেমে গেছে ন্যূনতম মাপের তলায়। গত মার্চ (২০১৮) মাসের হিসেবে জল আছে প্রয়োজনের ২৩%। আশঙ্কা করা হয়েছিল এপ্রিল মাস থেকেই কলের জল বন্ধ করে দিতে হবে; তবে অবস্থা সামাল দিতে পেরেছেন স্থানীয় প্রশাসন ২০১৮ জন্যে। বৃষ্টি সঠিক মাত্রায় না হলে পরের বছরের কথা কেউ বলতে পারছেন না। গত ফেব্রুয়ারি থেকে জনপ্রতি ৫০ লিটার জল পাওয়া যাচ্ছে।

এটা একটা বড় অশনি সঙ্কেত।

আমরা ইদানিং চেন্নাই শহরের খবর রোজ দেখছি টিভিতে, পড়ছি খবরের কাগজে। চেন্নাই শহরের একটা অংশের মানুষ হাঁড়ি কাঁধে ঘুরছেন জলের গাড়ির পেছনে; অবস্থাটা আমি আগে যা বলেছি, তার থেকেও খারাপ। আগের বছর আমরা বেঙ্গালুরু শহরেও একই সমস্যার কথা শুনেছি। তবে ভয়ের কথা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভারতের অনেক শহর, মফঃস্বল এলাকা প্রায় এরকম সমস্যার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে—কলকাতাও নিরাপদ নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সারা পৃথিবীতে জরিপ করে ১১টি শহরকে চিহ্নিত করেছে যাদের কেপটাউন হয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে ভারতের শহরও আছে। ব্যাঙ্গালুরুর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তবে অনেক ভারতের শহরেও গাড়িতে করে জল দিতে হয় গরমে এখনই সেখানকার অবস্থা কেপটাউনের চেয়ে খুব বেশি ভালো নয়। ভারতের ১৪ রাজ্যের সমীক্ষা বলছে ২৮টি শহর দিনে ৩ ঘন্টা জল পায়, আরো ১৪টি শহর পায় ১২ ঘন্টা জল।

জল পাওয়া উচিত দিনে জনপ্রতি ১৩৫ লিটার, ভারতে পাওয়া যায় কোথাও ২৯৮ লিটার, কোথাও মাত্র ৩৭ লিটার। আমাদের শহরগুলোতে গড়ে জল পাওয়া যায় দিনে জনপ্রতি ৭০ লিটার। আসলে ভারতের গৃহস্থরা রোজ যে জল ব্যবহার করে, বছরে ২৬০ ঘন-কিলোমিটার, তার প্রায় পুরোটাই আসে মাটির তলা থেকে। আমাদের দেশ ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি, সমস্ত পৃথিবীর ব্যবহার করা ভূ-গর্ভস্থ জলের ২৫% আমরা ব্যবহার করে চলেছি। পরিমানটা চিন বা আমেরিকার চাইতেও বেশি; মনে হয় বাঁধ নয়, কুয়োই হয়ে উঠেছে আধুনিক ভারতের মন্দির। আজ কৃষিতে ৭০% মাটির তলার জল ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাধীনতার সময় পরিমানটা ছিল ৩৫%। আজ ভারতে কম করে চার কোটি সেচের জন্যে ব্যবহার করা কুয়ো আছে; কোটি কোটি চাষি এই জল ব্যবহার করে চলেছে।

ভারতের 'নীতি আয়োগ' জানিয়েছে আগামী বছরেই ভারতের ২১টা শহরের ভূ-গর্ভস্থ জল শেষ হয়ে যাবে, তার মধ্যে আছে আমাদের রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরুর মতো শহরও। আমরা প্রকৃতিকে দোষ দিতে বড় ভালোবাসি, অথচ গত বছরই গল্প ফাঁদছি। ভারতে প্রত্যেক বছর দরকার ৩ লক্ষ কোটি ঘন মিটার বৃষ্টির সাধারণত আমরা ৪ লক্ষ কোটি ঘন মিটার বৃষ্টির জল পেয়ে থাকি তারপর মাথা চাপড়াই। কারণ বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার বা সঠিক পথে ব্যবহার করার না আছে কোন পরিকল্পনা, না কোন উদ্যোগ। পলি পড়ে বেশির ভাগ নদী-বাঁধের ধারণ ক্ষমতা গেছে কমে, বর্ষায় জল ছেড়ে সে বন্যাকে ডেকে আনে, শুখা মরসুমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দোহাই দিয়ে জল ছাড়ে না।

জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, মাটির তলার জলের স্তর নামছে; খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সকলকে সকাল হলেই বেরোতে হবে বালতি হাতে। তৈরি থাকুন।

M. 9836989347

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন
(জন্মশত বার্ষিকী দ্বিতীয় সংস্করণ)
মূল্য ঃ 150 টাকা

অর্থকরী মৎস্য বিজ্ঞান
কামাখ্যাপদ বিশ্বাস, মূল্য ঃ 100 টাকা

সেরা জ্ঞান ও বিজ্ঞান
(জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার পঞ্চাশ বছরের
(1948-1997) প্রবন্ধ সংকলন)
সম্পাদনা ঃ রতনমোহন খাঁ, মূল্য ঃ 300 টাকা

কৃমি
অমিয়কুমার হাটি, মূল্য ঃ 15 টাকা

ছোটনাগপুরের প্রান্তিক অরণ্য ও প্রাণী
হরিমোহন কুণ্ডু, মূল্য ঃ 50 টাকা

বোস সংখ্যায়ন (চতুর্থপ্রকাশ, 2015)
মহাদেব দত্ত, মূল্য ঃ 50 টাকা

রুচি রন্ধন পুষ্টি
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মূল্য ঃ 8 টাকা

কৃত্রিম সূর্য (টোকাম্যাক)
(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)
জয়ন্ত বসু, মূল্য ঃ 8 টাকা

আশ্চর্য প্রদীপের সন্ধানে
(রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 3)
জয়ন্ত বসু, মূল্য ঃ 8 টাকা

ইতিহাসে জ্যোতিষ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 4)
নন্দলাল মাইতি, মূল্য ঃ 50 টাকা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
(পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি-2014)
দ্বিজেশচন্দ্র রায়, মূল্য ঃ 250 টাকা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 5)
এম. এ. আজিজ মিয়া, (2য় মুদ্রণ) মূল্য ঃ 100 টাকা

তারা চিনিবার সহজ উপায়
(দ্বিতীয় মুদ্রণ) *রাধাগোবিন্দ চন্দ্র*
সম্পাদনা ঃ রণতোষ চক্রবর্তী,
মূল্য ঃ 60 টাকা

খাদ্য, ভোজ্য তেল ও হৃদরোগ
(2য় মুদ্রণ) *সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,*
মূল্য ঃ 10 টাকা

তাপ-রহস্য
অপরাজিত বসু, মূল্য ঃ 80 টাকা

পেট্রোলিয়ামের কথা
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 7)
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য ঃ 80 টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু-এক অনন্য বহুমুখী প্রতিভা
জয়ন্ত বসু, মূল্য ঃ 80 টাকা

বিবর্তনের পথে মানুষ
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 2)
(2য় সংস্করণ) *শঙ্কর চক্রবর্তী,* মূল্য ঃ 75 টাকা

আইনস্টাইনের উত্তরাধিকার
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুস্তকমালা ঃ 8)
পলাশ বরন পাল, মূল্য ঃ 120 টাকা

ছন্দে ছড়ায় জ্ঞান বিজ্ঞান
শিপ্রা বসু তালুকদার, মূল্য ঃ 40 টাকা

আইজাক নিউটন-- নিসর্গদর্শনের সিদ্ধসাধক
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তকমালা ঃ 9)
শিপ্রা বসু তালুকদার, মূল্য ঃ 40 টাকা

ভারতের গণিত গরিমা
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিপুস্তকমালা ঃ10)
(2য় সংস্করণ, 2015)
সত্যবাচী সর, মূল্য ঃ 120 টাকা

গল্পে গল্পে মহাকাশ ও প্রকৃতি পরিচয়
শিপ্রা বসু তালুকদার, মূল্য ঃ 100 টাকা

জীবনের জন্যে জল
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুস্তক মালা ঃ 12)
সুনীতিকুমার মণ্ডল, মূল্য ঃ 150 টাকা

কোয়ান্টাম তত্ত্ব
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিপুস্তকমালা ঃ13)
পরিমল মুখোপাধ্যায়, মূল্য ঃ 200 টাকা

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রবন্ধ
রমাতোষ সরকার, মূল্য ঃ 130 টাকা

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান
(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত 2য় সংস্করণ)
সত্যব্রত দাশগুপ্ত
মূল্য 175 টাকা

মহাকাশ পৃথিবী প্রাণ
সুবোধ ভট্টাচার্য, মূল্য ঃ 160 টাকা

আমার কথা
সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(2য় পরিমার্জিত সংস্করণ)
অনুলিখন পূর্ণিমা সিংহ
মূল্য 150 টাকা

গাছ গাছালির বিচিত্র কথা
জয়শ্রী দত্ত
(পরিমার্জিত 2য় সংস্করণ)
মূল্য 150 টাকা

আমাদের ছোটো পাখি
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিপুস্তকমালা ঃ11)
পরিমার্জিত 3য় সংস্করণ, 2016
জীবন সর্দার, মূল্য ঃ 150 টাকা

উনিশ শতকের কয়েকজন বাঙালি গবেষক—চিকিৎসক
(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিপুস্তকমালা : 14)
জীবন সর্দার, মূল্য ঃ 150 টাকা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু জীবন ও কৃতি
সম্পাদনা ঃ তপনমোহন চক্রবর্তী
মূল্য ঃ 350 টাকা

প্রকাশিত হল

কণা-পদার্থবিদ্যার বিস্ময়ভরা জগৎ
দিলীপ বসু, মূল্য ঃ 150 টাকা

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
(পরিমার্জিত 2য় সংস্করণ, 2019)
রণতোষ চক্রবর্তী, মূল্য ঃ 150 টাকা

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী

ঢোল—বুনোকুকুর

সাধারণ ইংরেজি নাম : **Hunting Dog**

বিজ্ঞানসম্মত নাম : **Cuon alpinus**

বুনোকুকুর যা ভারতে পাওয়া যায়—ঢোল নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন— **Indian Pariah dog, Asian Wild dog, Indian Wild dog, Whistling dog, Red dog, Mountain Wolf** প্রভৃতি।

পুরো এশিয়া মহাদেশে পাওয়া এক সময়কার এই প্রাণীটি এখন সীমিত অংশেই পাওয়া যায়। এদের দলবদ্ধ ও সুচতুরতা সহকারে শিকার করা পদ্ধতি বিড়াল পরিবারের সদস্যদেরও হার মানায়। কথিত আছে জঙ্গলে বাঘও এদের ভয় পায়। **IUCN**-এর লাল তালিকায় এরা বিপন্ন।

অমেরুদণ্ডী

বেঙ্গল অরনামেন্টাল মাকড়সা

সাধারণ ইংরেজি নাম : **Bengal Ornamental Spider (Spotted)**

বিজ্ঞানসম্মত নাম : **Poecilotheria miranda**

সুন্দর দেখতে বাংলায় এই অদ্ভুত সুন্দর ট্যারান্টুলা জাতীয় মাকড়সা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। এরা পুরুষরা সাধারণত ২-৩ বছর এবং মহিলারা ১১-১২ বছর বাঁচে। শুষ্ক ও রাঢ় বাংলায় মূলতঃ এদের দেখা যায়। নীলগিরি অঞ্চলে এদের প্রায়শই দেখা যেত। বর্তমানে **iucn**-এর লাল তালিকায় এরা 'বিপন্ন' ক্যাটেগরিতে নাম লিখিয়েছে।

পক্ষী

হারগিলা

সাধারণ ইংরেজি নাম : **Greater Adjutant Stork**

বিজ্ঞানসম্মত নাম : **Leptoptios dubius**

বিশ্ববন্যপ্রাণী সংস্থা iucn-এর মতে এরা আজ ভীষণ বিপন্ন। আজ এরা সারাভারতে দুর্লভ হয়ে পড়ছে। এরা মৃত ছোটি প্রাণীদের হাড় গিলে খেতে পারে বলে—বাংলায় এদের এরকম নামকরণ করে। পশ্চিমবঙ্গে খুব কম দেখা গেলেও পার্শ্ববর্তী আসাম সংলগ্ন বনাঞ্চলে টুকটাক দেখা যায়। বিভিন্ন জনজাতি অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পরম্পরাগত ওষুধের জন্য এই প্রাণীটিকে শিকার করে, এছাড়া এদের আবাসস্থল খাদ্য সংকটের জন্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে বসছে। একসময়কার কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের প্রতীকচিহ্ন এই প্রাণীটি।

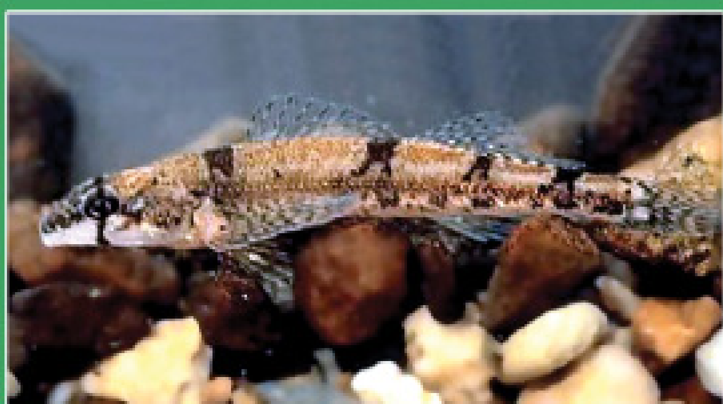

মাছ

অ্যাম্বার ডার্টার

সাধারণ ইংরেজি নাম : **Amber Darter**

বিজ্ঞানসম্মত নাম : **Percina antesella**

পার্চ (Perch) পরিবারের এই ছোট্ট মাছ আমেরিকার কোনাসওগা ও এতোয়া নদীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পরেছে এই ছোট্ট ডার্টার মাছ। এখানকার ল্যাটামাছের মত অনেকটা দেখতে এই মাছটা অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে যদি এখনই সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ না করা হয়।

email:rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178